প্রসাদী-ফুল। (৩)

নিরাপদ-ভূমি।

কোন এক গ্রামের সন্নিধানে একজন জ্ঞানী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, হিন্দু-দর্শন, বৌদ্ধ-দর্শন প্রভৃতি ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রে সু-বিজ্ঞ কয়েকজন লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শিষ্যবর্গের নিকট তিনি গ্রীক্, জর্ম্মান ও ইংরাজী দর্শন-শাস্ত্রের সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। নানা দিগ্ দেশ হইতে জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিত, মধুচক্রে মক্ষিকার ন্যায় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং তাঁহার বিচার ও মীমাংসায় পরিতুষ্ট ও বিগত-সন্দেহ হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত। অচিরে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল যে, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি বর্ত্তমান সময়ে সু-দুর্লভ। শুধু বিদ্বান্ নহেন, তিনি জ্ঞান-যোগী ছিলেন। শতশত নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

সন্ন্যাসী জ্ঞান-বলে আপনাকে এতই নিরাপদ মনে করিতেন যে, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের "বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।" অর্থাৎ বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে, এই উক্তিকে অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেন, তিনি বলিতেন, বিদ্বান্ ব্যক্তিকে ইন্দ্রিয়গণ কখনও আকর্ষণ করিতে পারে না।

সন্ন্যাসীর আশ্রমের সন্নিকটে এক জীর্ণ কুটীরে এক দরিদ্রা প্রৌঢ়া রমণী বাস করিত। একদিন রাত্রিযোগে সন্ন্যাসী সেই নিরাশ্রয়া প্রৌঢ়ার কুটীরের চালা বিদীর্ণ করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিলেন। অনাথা রমণী এই ঘটনা দর্শন মাত্র ঘরের বাহির হইল এবং বাহির হইতে দ্বারুদ্ধ করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক পাড়া প্রতিবেশীদিগকে সেইস্থলে উপস্থিত করিল। সন্ন্যাসী লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া মাটীতে পড়িয়াছিলেন, উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন দ্বার উন্মুক্ত করিলে তিনি বাহির হইয়া সকলের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। "এ ব্যক্তি আর কখনও এরূপ কু-কার্য্য করে নাই, ইহার হঠাৎ পতন হইয়াছে" এই কথা বলিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল এবং তাঁহার পতনে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী অন্ধকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু লোকের মনে এই এক বিষম প্রশ্ন উপস্থিত হইল যে "তবে জ্ঞানে কি হইল? জ্ঞান যদি সাধককে পতন হইতে রক্ষা করিতে না পারিল, তবে জ্ঞানের মাহাত্ম্য কি? বস্তুতঃ ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝা অসম্ভব।"

ভূপেন্দ্রনাথ দয়ার সাগর, যুবক যেন দয়ার দ্বারাই গঠিত। যেখানে অন্নক্লেশ কি দুর্ভিক্ষ, ভূপেন্দ্র সেখানে উপস্থিত। রাত্রি নাই, দিন নাই, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দুঃখীকে অন্ন যোগাইতেছেন, নিজের আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন, অর্দ্ধাশনে থাকিয়া আপনার অর্দ্ধেক অন্ন অন্যকে দান করিতেছেন। রোগীর শয্যাপার্শে ভূপেন্দ্রনাথ, দুঃখীর কুটীরে ভূপেন্দ্রনাথ, নিরক্ষরকে শিক্ষাদানে নিযুক্ত

ভূপেন্দ্রনাথ, এমন সৎকার্য্য কিছুই নাই, যাহার সহিত ভূপেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। এক দিনকার একটী ঘটনার উল্লেখ করিলেই ভূপেন্দ্রনাথের দয়ার পরিচয় পাওয়া যাইবে। একদিন তিনি কোন এক অনাথ রোগী বালকের জন্য ঔষধ পথ্য লইয়া রেল-যোগে দশক্রোশ দূরস্থ এক গ্রামে গিয়াছিলেন। রোগীর অবস্থা দেখিয়া তাহার সুশ্রূষার জন্য তাঁহাকে ৩।৪ দিন সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। যখন তিনি বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন রাস্তায় কতকগুলি দুঃখীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তাহারা তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিল। ভূপেন্দ্রনাথ বড়ই বিপদে পড়িলেন, একটু ইতস্ততঃ করিয়া সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, সমস্ত দান করিয়া দশক্রোশ পথ হাঁটিয়া বাড়ী আসিলেন, তাঁহার পা ফুলিয়া গোদ হইয়াছিল।

এই দয়ার সাগর, কর্ম্মযোগী ভূপেন্দ্রনাথকে তাঁহার একজন ডাক্তার বন্ধু হঠাৎ কোন এক কারাগারে কয়েদীর পোষাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভূপেন্দ্রবাবু, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? আপনি এখানে কি অপরাধে? আপনাতে কি পাপ সম্ভবে?" ভূপেন্দ্র উত্তর করিলেন—"আমি দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারের অর্থ অপহরণ করিয়াছি।" বন্ধু বলিলেন, "ইহা কি সত্য? এমন দয়ার শরীরে কি এমন কু-কার্য্য সম্ভব হয়? যিনি দুঃখীর পাতে একমুঠা অন্নদিতে আপনি উপবাস করিয়াছেন, তিনি কি দুঃখীর পাতের ভাত কাড়িয়া লইয়াছেন? বোধ হয় নিরাপরাধে আপনার শাস্তি হইয়াছে।" ভূপেন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিলেন "না, আমি সত্যসত্যই অপরাধী।" বন্ধু বলিলেন, "তবে ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিলাম না। ঐকান্তিক সৎকর্ম্মও লোককে পতন হইতে রক্ষা করিতে পারে না।"

হরিহর একজন ভক্ত; ভগবানের নাম করিলে গলিয়া যান। ভজনে কি কীর্ত্তনে তাঁহার ভাব যে দেখিয়াছে, সে-ই মোহিত হইয়াছে। তাঁহার সেই ভক্তিভাবের মধ্যে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা নাই। একদিন এক কীর্ত্তনের দলের সঙ্গে রেলে করিয়া হরিহর কোন এক গ্রামে যাইতেছিলেন, রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অনেক দূর পথ হাঁটিয়া সেই গ্রামে যাইতে হইবে। সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। এদিকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন সকলে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, আর কাহারও পা চলে না। তখন একজন বলিলেন, "অদূরে গোঁসাই হরিদাসের কুটীর দেখা যাইতেছে।" এই কথা শ্রবণ মাত্র কীর্ত্তনকারিগণের মধ্যে নব-বলের সঞ্চার হইল, হরিদাস প্রভুর নামে সকলে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন, কোথায় গেল ক্ষুধা, কোথায় গেল পিপাসা, কীর্ত্তন করিতে করিতে কুটীরের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রেমাবেশে সকলের শরীর ভারি হইয়া পড়িল। মত্ত মাতালের মত মাতোয়ারা হইয়া কুটীরের চৌকাট পার হইতে ভাবাবেশে চরণ অবসন্ন হইয়া পড়িল। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত এই ভাবের স্রোত বহিল। এই ভক্তদলের মধ্যে হরিহরের ভাবভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অপূর্ব্ব ছিল। তাহাতে কিছুমাত্র কৃচ্ছ বা কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু হায়! এই হরিহর আপন আশ্রয়দাতার বাড়ীতে এমন একটী কুকার্য্য করিয়া পলায়ন করিল যে, পরদিন হইতে সকলে তাহার নামে ধিক্কার দিতে লাগিল, এবং বলিতে লাগিল, যে "তবেত ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝা গেলনা, এরূপ অকপট ভক্তেরও যদি এইরূপ পতন হইল, তবে আর ভক্তিপথ ধর্ম্মকে রক্ষা করিল কৈ?

এইরূপে জ্ঞানী, কর্ম্মী, ও ভক্ত, ত্রিবিধ সাধকের পতন দেখিয়া সাধারণত ধর্ম্মের প্রতি লোকের অবিশ্বাস জন্মে, লোকেরা মনে করে, ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই মিথ্যা, ভগবানের নামের কোন মাহাত্ম্য নাই।

এক শ্রেণীর লোকেরা এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া বলেন যে, একাঙ্গ সাধনার দোষেই এইরূপ বিপদ ঘটে, যদি কোন সাধক জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমানভাবে সাধন করিতেন, তবে এরূপ দোষ ঘটিত না, এরূপ পতনের সম্ভাবনা থাকিত না। বাস্তবিক একথাও ঠিক নহে। সেই জ্ঞানী সন্ন্যাসীর জ্ঞান, ভূপেন্দ্রনাথের কর্ম্ম, এবং হরিহরের ভক্তি যদি এক ব্যক্তিতে প্রকাশ পাইত, তথাপি পতনের হস্ত হইতে তাহার রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না। কারণ সেই পরিমাণ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, কেহই সাধককে রক্ষা করিতে পারে না। আবার কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি যে কোন সাধকের সাধন কালে সমান ভাবে ফুটিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। বাগানের মালী যেরূপ পাতা বাহারের গাছগুলিকে কাঁচি দ্বারা ছাটিয়া একাকার করিয়া দেয়, একখানি ডালকে বেশী বাড়িতে দেয় না, সাধকের হৃদয়োদ্ভূত ভাবগুলিকে সেইরূপ ছাটিয়া কাটিয়া দেওয়ার কোন মালী বা অস্ত্র নাই। যদি থাকিত, তবে জগতের বড়ই দুর্দ্দশা হইত, কেন না, ধর্ম্মের কোন অঙ্গই স্বাভাবিক ভাবে বাড়িবার অবকাশ পাইত না, ধর্ম্ম ছোটই থাকিয়া যাইত। বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীর অবোধ বালকের সঙ্গে যদি সুবোধ কালককে অপেক্ষা করিতে হয়, তবে সে কখনই অগ্রসর হইতে পারেনা। বৃত্তি সমূহের সদ্বিকাশ * Harmonious development) সাধারণ লোকদিগের জন্য বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়-বিশেষে অসাধারণত্বই তাঁহাদের মহত্ত্বের নিদর্শন। বুদ্ধদেব, যিশুখ্রীষ্ট ও শ্রীগৌরাঙ্গ শৃঙ্খলা করিয়া সংসার করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের অসাধারণত্ব ও মহত্ত্ব বিনষ্ট হয় নাই, সংসার করিতে গেলে তাঁহারা ছোট হইতেন। এই সকল জগৎপূজ্যদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বৈজ্ঞানিক জগতের ব্যক্তিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাৎ করিলেও দেখা যায় যে, এক এক বিষয় লইয়া এক একজন পাগল, অন্য জ্ঞানশূন্য হইয়া একই সাধনায় তন্ময় হইয়া আছেন। দশ-কর্ম্মান্বিত পুরোহিতের মতন সকল ব্যঞ্জনের হলুদের গুঁড়া হইলে তাঁহাদের কিছুমাত্র বিশেষত্ব থাকিত না। তাঁহাদের দ্বারা জগতের কোন উপকারও হইত না।

এ সকল গেল বিতর্কের কথা, শ্রীশ্রীগুরুদেব উপরোক্ত কঠিন প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, সাধকদিগের পতন দেখিয়া ধর্ম্মের প্রতি জন-সাধারণের যে সন্দেহ জন্মে, সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, নিম্নে তাহাই নিবেদন করিতেছি। তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ-সত্য, যাহা জীবনে প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহা তিনি বলিতেন না। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "যে সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ কর নাই, তাহা প্রচার করিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "যদি গুরুমুখে শুনা যায়, তবু কি তাহা বিশ্বাস করিব না?" তিনি বলিলেন "কোন কিছু বিশ্বাস করা না করা মানবের ইচ্ছা সাপেক্ষ নহে, বিশ্বাস যদি হয়, তবেত বিশ্বাস করিতেই হইবে, কিন্তু যতদিন সেই সত্য

* সম্ অর্থ সঙ্গত, তুল্য, সমান। সম্+বিকাশ =সম্বিকাশ, সমান ভাবে তুল্য রূপে বিকাশ পাওয়া।

নিজের প্রত্যক্ষ না হয়, ততদিন পরকে তাহা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। তিনি নিজে যে আচরণ করিতেন, শিষ্যদিগকে তাহাই উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই, শাস্ত্রে, প্রবর্ত্তক, সাধক ও সিদ্ধ, এই তিনটী অবস্থার কথা আছে। প্রবর্ত্তক ও সাধকের পতন কিছুই আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় আর পতন নাই। এই সিদ্ধাবস্থার অর্থ এই যে, মানুষের এমন একটী অবস্থালাভ হয়, যে অবস্থায় মানুষ অচ্যুতপদ প্রাপ্ত হয়। যদি চিরদিনই পতনের সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত মানুষের পরিত্রাণ লাভের আশা থাকিত না, অনন্ত কালই নরকের আশঙ্কা থাকিত। গোলকধাম খেলার খেলোয়াড়িগণ এক একবার উৎকৃষ্ট লোকে যাইতেছে, অনতিবিলম্বে শুণ্ডিকালয়ে পতিত হইতেছে, সেখান হইতে নরককুণ্ডে এবং নরককুণ্ড হইতে সূতিকাগারে আসিয়া আবার কাঁচিয়া বসিতেছে। এইরূপ উত্থান পতন অনবরত চলিতেছে, কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে যে ব্যক্তি একবার "ব্রহ্মলোক' নামক ঘরে উপস্থিত হইতে পারিল, তাহার আর পতন নাই, খেলায় দান যাহাই পড়ুক না কেন, তাহার আর পতন নাই। যদি উৎকৃষ্ট দান পড়ে, তবে গোলকধামের দিকে ঊর্দ্ধগতি হইল, যদি না পড়ে, সেই ব্রহ্মলোকেই বিশ্রাম করিতে লাগিল। তাহার আর পতন নাই। ইহাই অচ্যুত অবস্থা। সাধক যে পর্য্যন্ত এই অচ্যুত অবস্থা লাভ না করেন, ততদিন প্রতিপলকে পতনের সম্ভাবনা আছে, তাঁহার পতন দেখিয়া ধর্ম্মের প্রতি সংশয় জন্মিবার কোন কারণ নাই

আর একটী দৃষ্টান্ত,—

সমভূমির দশহাত নীচে জল আছে, তোমাকে একটী কূপ খনন করিয়া জল উত্তোলন করিতে হইবে। প্রতিদিন তুমি কিছু কিছু করিয়া মাটী কাটিয়া কূপ খনন করিতেছ, দশ হাতের এক অঙ্গুলী অবশিষ্ট থাকিতেও তুমি গণ্ডূষ মাত্র জল পাইবেনা। দশ হাত খনন করা হইলে ভোগবতী গঙ্গা পাতাল হইতে আসিয়া তোমার সাধনা সার্থক করিয়া দিবেন। কিন্তু তুমি যে নয় হাত খনন করিয়া জল পাও নাই, এজন্য যদি কেহ বলে যে "এই লোকটা জলের জন্য মাটী খুড়িয়া মরিতেছে, কিন্তু জলের সঙ্গে সম্পর্ক নাই" তাহার যেরূপ উক্তি যুক্তিযুক্ত হইবে না। সেইরূপ, সাধক যতদূর গেলে তাঁহার পিপাসার বারি পাইবেন, তিনি প্রবর্ত্তক কি সাধক অবস্থায় ততদূর যাইতে পারেন নাই, মাঝে মাঝে তাঁহার বিঘ্ন ঘটিতেছে, এজন্য সাধকের সাধনাকে এবং তাঁহার সাধ্য বস্তুকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধকগণ নিরাপদ অবস্থা লাভ না করেন, ততক্ষণ মনে করিতে হইবে যে, তাহারা গাছের আগডালে শয়ন করিয়া আছেন, কোন্ মুহূর্ত্তে পতিত হইবেন, তাহার ঠিকানা নাই। যে সাধকের কিছুমাত্র আত্ম-দৃষ্টি আছে, সে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকে, অন্যের পতন দেখিলে সে পরিহাস করেনা, ভীত হয়। নিজকে একান্ত দীন হীন মনে করিয়া আত্ম-রক্ষার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকে। প্রখর নদীর স্রোত, বড়ই উজান পড়িয়াছে, রাত্রি আগতপ্রায়, তাহাতে ডাকাইতের ভয়-ঙ্কর উপদ্রব, সাথী-নৌকাগুলি চলিয়া যাই-তেছে, এই অবস্থায় পড়িয়া নৌকার মাঝিগণ যেমন প্রাণপণে দাঁড় টানিতে থাকে, পলকের বিরাম নাই, শ্বাস লইবার সময় নাই, অনবরত

কেবল দাঁড়ের টান পড়িতেছে, টানের উপর টান। এই এক বাঁক উজান কাটিয়া উঠিলেই জোয়ার পাওয়া যাইবে, তখন শুধু হালটী ধরিয়া তামাক খাইতে খাইতে নিশ্চিন্ত হইয়া বন্দরে পৌঁছাইতে পারিবে, কিন্তু এই এক বাঁকের মধ্যে আলস্য করিলে, বিশ্রাম করিলে আর রক্ষা নাই, ডাকাইতের হাতে নিশ্চয় মৃত্যু। সঙ্গিগণ আগে চলিয়া যাইতেছে, একাকী ডাকাতের হাতে পড়িয়া নিশ্চয় মৃত্যু। সাধকের মনের ভাব, সাধকের মনের অবস্থা যখন এইরূপ হয়, তখন তাঁহার ধর্ম্ম আরম্ভ হয়। তখন কেবল ত্রাহি ত্রাহি! বাজে কথা, বাজে কাজ, বাজে আলাপ কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না, একটী শ্বাস বৃথা ফেলিবার তাঁহার অবসর নাই, সেই বিপন্ন মাঝির মত উপর টান, অন্য কথা কিছু নাই, অন্তরে সর্ব্বদাই ত্রাহি ত্রাহি। প্রবর্ত্তক ও সাধকের অবস্থা এইরূপ।

অরুচির মুখে মিছরিও তিক্ত লাগে, কিন্তু মিছরিই সেই পিত্ততিক্ত রোগের মহৌষধি। সেইরূপ, বিষয়-বিকার-গ্রস্ত মানুষের নিকট ভগবানের সুধাময় নাম ভাল লাগে না, পরন্তু তিক্ত বোধ হয়, কিন্তু সেই নামই এই শুষ্কতা-বিকারের একমাত্র মহৌষধি। নাম জপ করিতে করিতে সেই নাম মিষ্ট লাগিতে থাকে, ক্রমে ক্রমে সেই নামামৃত পানে সাধকের নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত অমৃতময় হইয়া যায়। সেই অমৃত চুষিতে চুষিতে অন্য আকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া সাধক নিষ্পাপ হয়, তখন "সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম" আপনি প্রাণে প্রকাশিত হন। এই অবস্থা যখন স্থায়ী হয়, তখন সাধক সিদ্ধাবস্থা লাভ করেন, নিরাপদ ভূমি প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হন, তখন আর পতনের ভয় থাকেনা।

নিরাপদ ভূমিতে উপস্থিত হইতে যাইয়া রাস্তায় যদি সাধকের পতন হয়, সাধক যদি সে অবস্থায় কখন কিছুকালের জন্য বিপথেও চলেন, সেজন্য তাঁহার সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়া যায় না, কেননা, ধর্ম্ম একটা মানসিক-পীড়া নহে। যিনি ধর্ম্মাবহ, তিনিই ব্যাকুল আত্মাকে স্বহস্তে ধারণ করেন, সাদরে গ্রহণ করেন এবং অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে ও মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া গিয়া নিরাপদভূমি প্রদান করেন। এই যে নিরাপদ ভূমি, ইহাই ব্রহ্মলোক, এই স্থান হইতে আর পতন নাই, এখান হইতে সাধক অনন্ত উন্নতির পথে চলিয়া গোলক-ধামে যাত্রা করেন। ইহা কল্পনার কথা নহে, ইহা সাধক-জীবনের প্রত্যক্ষ সত্য। যদি এ বিষয়ের সাক্ষী না থাকিত, তবে ধর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া যাইত। অতএব কাহারও কাহারও পতন হইয়াছে, অথবা নয় হাত পর্য্যন্ত খুঁড়িয়াও কেহ বিন্দুমাত্র জল পায় নাই, তাহা দেখিয়া ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা কি অবিশ্বাস হওয়া উচিত নহে। নিরাপদভূমি প্রাপ্ত না হইলে প্রতি দণ্ডে পতনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। যখন সাধক এই ভূমির নিকটবর্ত্তী হন্, তখন তাঁহার জীবনে স্তরে স্তরে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। শাস্ত্রে সে সকল অবস্থার নির্দ্দেশ আছে, খামখেয়ালী করিয়া কেহ বলিতে পারিবে না যে, নিরাপদভূমি পাইলাম। লক্ষণের সহিত মিল হওয়া চাই। যতদিন এই অবস্থা-লাভ না হয়, ততদিন সাধকের অন্তরে কেবল ত্রাহি, ত্রাহি।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

একখানি পত্র।

ভক্তিভাজন

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম-এ

মহোদয় সমীপেষু—

আপনার প্রণীত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড পাঠ করিলাম। এখানে একথা বলা বাহুল্য যে, আমি শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাব লইয়া গ্রন্থপাঠে অগ্রসর হইয়াছিলাম। আপনার সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া এবং আপনি আমাদের প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া আপনার কার্য্যকলাপের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান আপনাআপনি জাগিয়া উঠে। বিগত কয়েক বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য কলাপের সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রক্ষা করিবার সুবিধা না থাকায় আমি দুঃখিত, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস লিখিতে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন, সে বিষয়ে আমার এবং অন্য অনেকের অভিজ্ঞতা আপনার অপেক্ষা অল্প নহে। সেই জন্য সর্ব্বাগ্রে এই কথা বলিতে চাই যে, এই গুরুতর কঠিন কার্য্যে আপনি হাত না দিলেই ভাল করিতেন। আমার বিবেচনায় আপনার এই কাজটী সুসঙ্গত ও সুসম্পন্ন হয় নাই। সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ইতিহাস ইহাকে বলে না।

এই বৃদ্ধ বয়সে, ভগ্ন শরীর লইয়া আপনি এই গ্রন্থ রচনায় যে গুরুতর শ্রমভার বহন করিয়া এ কাজটী শেষ করিতেছেন, ইহাতে আপনার অসীম অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই। আপনার বন্ধুমণ্ডলী ও অনুরাগী ব্যক্তিগণ যে কৃতজ্ঞ হইবেন এবং শত শত সাধুবাদ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি অকপটে সেই প্রশংসাবাদে যোগ দিতেছি। আপনি যে উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতার জীবন্ত মূর্ত্তি, তাহা আপনার আধুনিক পার্শ্বচরগণ উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত না হইলেও, আমাদের হৃদয়ে আপনার সে কালের সে অনন্যসাধারণ কর্ম্মপটুতার নিখুঁত ছবি মুদ্রিত আছে। এ পর্য্যন্ত সে চিত্রপটের কোথাও একবিন্দু মলিনতা স্পর্শ করে নাই। আপনার সেই জলন্ত নিষ্ঠাই সে কালে আমাদিগকে কর্ত্তব্যপরায়ণ ও কর্ম্মানুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল। তাই বলিতেছি, আমি এবং আমার মত অনেকেই আপনার প্রথম বয়সের প্রথম কার্য্যক্ষেত্রের ফল। আমরা যাহাই হই, উত্তম বা অধম ফল হই, তাহার গুণাগুণের জন্য আপনিই যে পুরস্কার ও তিরস্কারের পাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা আপনার উপদেশ ও পরামর্শেই গঠিত হইয়া উঠিয়াছি। আজ তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে কৃতজ্ঞতাসহ স্বীকার করিতেছি। আর যে সাহসে নির্ভর করিয়া আজ এই প্রকাশ্য পত্র খানি আপনাকে লিখিতেছি, আপনিই সে সাহস ও সুবিবেচনার শিক্ষাদাতা গুরু। অর্থাৎ "বহু লোকের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইলে, নির্ভয়ে প্রকাশ্য ভাবে সত্যের আলোচনা করিতে হইবে।"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আপনি যখন স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য চন্দননগরে গঙ্গাতীরে বাস করিতেন, তখন একদা আমাকে একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লিখিয়া পাঠান। আপনার আদেশানুযায়ী আমি দিন

স্থির করিয়া চন্দননগরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি। তখন আপনার এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ড রচনা শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড লিখিবেন কি না, সে বিষয়ে তখনও আপনার মীমাংসাবুদ্ধি সন্দেহের দোলায় দুলিতেছিল। এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ড তখন যেরূপভাবে শেষ করিয়াছিলেন, এখন দেখিতেছি, প্রথমখণ্ডে তাহা অপেক্ষা অধিক উপকরণ ও তৎসংসৃষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাকে যে সকল অংশ আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন, তাহাতে আমার মনে হইয়াছিল এবং আপনাকেও বলিয়াছিলাম যে, আপনার অবলম্বিত পদ্ধতি-অনুসারে ইতিহাস লেখার দিন চলিয়া গিয়াছে। গতানুগতিকের ন্যায় কতকগুলি বিবরণ পর পর লিপিবদ্ধ করিয়া গেলে, আজকালকার হিসাবে ইতিহাস হয় না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে, বহুযুগের প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রে, ব্রাহ্মসমাজরূপ শক্তিকেন্দ্রে শক্তির উৎস ও সে উৎসজাত উত্তম ফলের প্রতি সমগ্র দেশের ও পৃথিবীর লোক-মণ্ডলীর দৃষ্টি-আকর্ষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ ইতিহাসে যাহা যাহা থাকা আবশ্যক, সে সকলের সামান্য ইঙ্গিতমাত্র করিয়া আমি আপনাকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন মনীষী ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিতে অনুরোধ করিবামাত্র, আপনি সাগ্রহে সম্মত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যস্ততা প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহার ঠিকানা একখানি পোষ্টকার্ডের পৃষ্ঠে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া লইলেন। পরে অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম, আপনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া দিনস্থির করিয়া লিখিত ইতিহাস সহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং কোন কোন অংশ তাঁহাকেও শুনাইয়াছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হউক, তাঁহার পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই; কেন করেন নাই, তাহা জানি না। কিন্তু এটা বেশ বুঝি যে, তাহা করিলে, এ গ্রন্থ ইহা অপেক্ষা শতগুণে উত্তমতর আকারে প্রকাশিত হইত। আক্ষেপের বিষয় যে, আপনাকে এবং আপনার সঙ্গে সঙ্গে আপনার পাঠক-মণ্ডলীকে একটা ভাল জিনিসের সম্ভোগ-সুখে বঞ্চিত হইতে হইত না। আর বর্ত্তমান আকারে যাহা বাহির করিয়াছেন, ইহাতে যে সকল অনাবশ্যক অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের আলোচনায় আপনি সময় ক্ষয় করিয়াছেন, সে অবিবেচনার অপবাদ হইতে আপনি রক্ষা পাইতেন এবং আপনার পাঠক-মণ্ডলীরও মর্ম্মবেদনার কারণ হইতেন না।

আপনি সাধারণ সমাজের বাঙ্গালা-মুখপত্র তত্ত্বকৌমুদীতে একটী বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার পাঠক-মণ্ডলীকে জানাইয়াছেন যে, যদি কেহ কোন ত্রুটী বা ভ্রম লক্ষ্য করেন, কিম্বা কোন বিশেষ বিষয়ের আলোচনা হয় নাই বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে পত্রের দ্বারা আপনাকে জানাইলে ভাল হয়। এরূপ বিজ্ঞাপন বিদ্যমানে আমার আলোচ্য বিষয়গুলি আপনার নিকট না পাঠাইয়া সংবাদপত্রে আপনাকে জানাইবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে—আমার বক্তব্য এই যে, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বার্ষিক সভায় পঠিত কার্য্য-বিবরণের নানাস্থানে যে সকল ত্রুটী পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং সে সকলের যেরূপ পরিবর্ত্তন সভ্যেরা প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, সে সকল পরিবর্ত্তনসাধন সর্ব্বদাই কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উপর

নির্ভর করিয়াছে। এবং সেরূপ রীতি-পদ্ধতির প্রচলনে অধুনা স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় ও আপনি ও আপনার মত আরও দুএকজন ব্যক্তি দায়ী, এবং সেই ব্যক্তিগত ব্যূহ ভাঙ্গিয়া সাধারণের উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে এখানেও প্রচুর বাধা বর্ত্তমান। সেই বাধা ভেদ করিয়া কার্য্য করা যখন অনেকেরই পক্ষে কঠিনতর হইয়া উঠিয়াছিল, তখন অনেকগুলি স্বাধীনচেতা ধর্ম্মপরায়ণ ও মুক্তি-প্রয়াসী ব্রাহ্ম ক্রমশঃ এখানেও দূরে দূরে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমি এরূপ লোকের তালিকা প্রস্তুত করা নিরাপদ মনে করি না।

কেবল এই মাত্র বলিতে চাই যে, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম কয়েক বৎসরের গঠন কার্য্য আপনার নবোদ্যমপূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জন ভিন্ন সম্ভবপর হইত না, আনন্দমোহন, শিব-চন্দ্র ও দুর্গামোহনের শত চেষ্টাতেও সাধারণ সমাজ গড়িয়া উঠিত না। প্রত্যেক মহৎ কার্য্যের মূলে আত্মবিসর্জ্জনরূপ দেব-শক্তির আবির্ভাবের প্রয়োজন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠার মূলে সেই এক আত্মবলি আপনিই দিয়াছিলেন, তাই সাধারণ সমাজ সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু সেই আপনিই পর-বর্ত্তী কালে স্বকৃত নিয়মাবলীর বন্ধন বহন করিতে অসম্মত হইয়া, স্বয়ং সমাজের মধ্যে থাকিয়াও, স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিবার জন্য কিয়ৎপরিমাণে নিয়মমুক্ত কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য "সাধন-আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কখন করিলেন? যখন দেখিলেন, সাধারণ সমাজের কর্ত্তৃপক্ষ সহজে আপনাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, তখন করিলেন। পূর্ব্বে প্রাথমিক অবস্থায় সম্পাদক ও সভাপতি হইয়া আপনি সমাজের কাজ যথা-শক্তি সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে কখনই আপনি সন্তুষ্ট চিত্তে এ সকল কাজ করিতে পারেন নাই। সর্ব্বদাই অপ্রীতিকর ঘটনায় আপনাকে বিব্রত হইতে হইয়াছে।

স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় দশ-জনকে লইয়া দশজনের মতামত বুঝিয়া কার্য্য করিবার শক্তি ধারণ করিতেন। তাঁহার সমগ্র জীবনের শিক্ষা দীক্ষা তাঁহাকে পাশ্চাত্য ভাবানুযায়ী শক্তিকেন্দ্রে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিল। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন ও আপনি, শক্তি সামর্থ্যের পরিচালনে পরস্পর হইতে বহুদূরবর্ত্তী হইলেও, প্রকৃতি ও ধাতুতে একই পদার্থ। তিনি ও আপনি উভয়েই আত্মপ্রাধান্যপরায়ণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। ভারতীয় হিন্দু প্রধানগণের প্রাধান্যের ভাব আপনাদের উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান। তাই আপনিও শেষে কেশবচন্দ্রের অনুকরণে নিজের একটী স্বতন্ত্র দল গঠনের প্রয়াসী হইয়া সাধন-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের অসামান্য শক্তির অভাবে আপনার নূতন পোষ্যবর্গ অপর সাধারণের নিকট সেরূপ বল-বিক্রমের পরিচয় দিবার সুযোগ পাইলেন না। যে কারণে আপনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে, ভিতরে থাকিয়াও দূরে রহিয়াছেন, সেই পরিমাণে আপনি ও সাধারণ সমাজ পৃথক ভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, সে দুর্ব্বলতার আর এখন প্রতি-বিধান হয় না, হইবেও না। কেশবচন্দ্রের শেষ জীবদ্দশায় ও তাঁহার লোকান্তর গমনের পর নববিধান সমাজ যেমন দুর্ব্বল, আপনিও বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই সাধারণ সমাজও সেইরূপ অবসন্ন দশা-প্রাপ্ত। বিকারের রোগীর ন্যায়, নববিধান ও সাধারণ, কেহই

আপনাদের রোগ ঠিক ধরিতে ও তাহার প্রতিকার করিতে অক্ষম। এই অক্ষমতা আপনাদের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাই আমি মনে করি যে, আপনার রচিত ইতিহাসে যে সকল অসঙ্গত ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় সকলের আলোচনা করিয়াছেন, সে গুলি গোপনে পত্রের দ্বারা দেখাইয়া দিলে সম্ভবতঃ আপনি সে গুলির সংশোধন করিবেন না। সংশোধন করিবার হইলে পূর্ব্বেই করিতেন।

হিন্দু সংস্কার অনুসারে "গ্রহ-বৈগুণ্য" বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। অশ্লেষা ও মঘা মানুষের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, ইহাও হিন্দু-সংসারে চির বিদিত। আচার্য্য, উপদেষ্টা ও গুরুস্থানীয় ব্যক্তি হইলেও, কেশবচন্দ্রের প্রতি আপনার প্রচুর সম্মানের ভাব, শ্রদ্ধার ভাব বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহার প্রতি আপনার অশ্লেষার দৃষ্টি—মঘার মারাত্মক আক্রমণ গোপনে গোপনে কার্য্য করিতেছে কেন? তিনি বহুদিন লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহার বিষয়ে যুক্তিযুক্ত? ন্যায়সঙ্গত ও ধর্ম্মানুমোদিত আলোচনায় কেহ আপত্তি করিবে না। অধুনা শোকের ব্যাপারে পরিণত হইলেও, কুচবিহারবিবাহবিষয়ক আলোচনা মোটের উপর বিধি-সঙ্গত ভাবেই সম্পন্ন করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে তাতেও আপনার হৃদয়ের লুক্কাইত দারুণ বিরুদ্ধ ভাব বাহির করা যায়, কিন্তু তত খুঁটাইয়া অনুসন্ধান করিয়া আপনার ভিতরের ভাব বাহির করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে বিষয়টী সর্ব্ববাদীসম্মত অন্যায় কাজ, আমি কেবল সেই বিষয়টী সর্ব্বাগ্রে দেখাইতেছি। শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনীতে কেশবচন্দ্রের ছাত্রজীবনের সামান্য একটা ঘটনাকে অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণনা করিয়া ইতিপূর্ব্বেই আপনি নিন্দার পাত্র হইয়াছিলেন। আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই, রামতনুবাবুর জীবন-চরিতে কেশব বাবুর বাল্যজীবনের একটা ভ্রম বা অসাবধানতাকে উত্তমরূপে স্থায়ী করিবার প্রয়াস আপনার হৃদয়ে কেন স্থান পাইল? আপনি সে জীবন-চরিতে "ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি" এইরূপ ভূমিকা করিয়া সে সময়ের অনেক ব্যক্তির বিষয়েই আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহাদের বিষয় কিছু কিছু বলিয়াছেন, তাঁহাদের আর কাহারও সম্বন্ধে কি কেশবচন্দ্রের পরীক্ষাবিষয়ক ত্রুটীর ন্যায় কোন প্রকার সামান্য বা বৃহৎ ত্রুটী দেখিতে পান নাই? অথবা আপনি ঐরূপ বহু লোকের জীবনী-আলোচনাক্ষেত্রে কেবল কেশবচন্দ্রেরই দোষ দেখিতে পাইয়াছিলেন? "চাঁদে কলঙ্ক" সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু অপর সকলের কলঙ্ক-কালিমা ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র কেশবচন্দ্রের কলঙ্ক রটনায় এত ব্যস্ততা প্রদর্শন আপনার শিক্ষা দীক্ষা, পদমর্য্যাদা ও ধর্ম্ম-বুদ্ধির সমক্ষে কি একটা সঙ্গত কাজ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন? লিখিতে বসিয়াছিলেন রামতনু বাবুর জীবন-চরিত, তাতে আপনার আচার্য্য ও উপদেষ্টার কোষ্ঠী প্রণয়নের কি প্রয়োজন ছিল? আপনি কি আপনার পাঠকমণ্ডলীকে এ কথা বেশ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন? কেশবচন্দ্রের জীবনী রচনা হইলেও বা কথা ছিল, কিন্তু ঐ বৃহৎ গ্রন্থের কয়টী পৃষ্ঠা কেশবচন্দ্রের আলোচনায় ব্যয় করিয়াছেন, এবং তাঁহার বহু কর্ম্মের সমগ্র উত্তমাংশ আলোচনা করিয়া কি স্থান এত প্রচুর এবং প্রয়োজনীয়তা এত প্রবল হইয়াছিল

যে, ঐ পরীক্ষার কথাটা না বলিলে সে স্থানে আপনার ধর্ম্ম-বুদ্ধি আপনাকে তিরস্কার করিত। আপনার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া যদি স্বীকার করিয়া লই যে, আপনার কালী কলম, আপনার মন, ঐরূপ ভাবে অন্যের জীবন-চরিতে কেশবচন্দ্রকে ঐ প্রকারে চিত্রিত করার অধিকারের সুসঙ্গত যুক্তি আপনার ছিল, তাহা হইলে, অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধে যে উহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলের আলোচনায় বিরত রহিলেন কেন? সেখানে আপনার সুবিবেচনা আপনাকে তিরস্কার করিল না?

এটা বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় যে, যেখানে সে বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন নাই, সেখানে তাহা করিলেন, যখন করিলেন, তখন সকলের প্রতি একটা সাম্যের ভাব প্রদর্শন করা আপনার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানই আপনার পক্ষে আদর্শ কার্য্য হইত। আপনি তাহা করেন নাই, এবং সে জন্য যথেষ্ট তিরস্কৃতও হইয়াছেন। কিন্তু ঘোর পরিতাপের বিষয় এই যে, সে তিরস্কারে আপনার কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদয় হয় নাই। আপনি এই বর্ত্তমান আলোচ্য ইতিহাস গ্রন্থেও পুনরায় সেই অপ্রীতিকর অনাবশ্যক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন এবং পূর্ব্বে আপনার ঐরূপ আলোচনার যে উত্তর বাহির হইয়াছিল, সে গুলির ও প্রত্যুত্তর দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এতেই বুঝা যায় যে, আপনি 'কেশবচন্দ্রের পরীক্ষাগারের ব্যাপারটীকে সাধারণ মানবীয় অসাবধানতা অপেক্ষাও গুরুতর বলিয়া অনুভব করিয়াছেন এবং তাহাকে লর্ড কর্ণওয়ালীশের দশশালা বন্দোবস্তের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছেন। কিছুতেই ছাড়িবেন না!

যদি নিতান্তই ঐ ঘটনা ত্যাগ করিতে অসম্মত হন, দুঃখ নাই, আমরা মনে করিব, এটা আপনার একটা দুর্ব্বলতা, কিন্তু কখনই ইহাকে ন্যায়বিচার বা বিধিসঙ্গত অনুষ্ঠান বলিব না, কেন বলিব না, তাহাই দেখাইতেছি। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছেন, সেই ইতিহাসে মহর্ষি মহোদয়ের জীবন-সংগ্রাম বর্ণন করিয়াছেন, আর তাহা মোটের উপর এক প্রকারে সুন্দরই হইয়াছে, পড়িতে আনন্দ হয় এবং লেখকের দূরদর্শন ও চিন্তাশীলতার প্রচুর প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের সংগ্রাম-সংবাদটুকুও আপনার পাঠকমণ্ডলীকে দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই কেন? এখানে এ মজ্জাগত, দুর্ব্বলতার পরিচয় দিবার আপনার কি অধিকার ছিল? যে অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবকের পরীক্ষাগারে অপর কোন বালকের সঙ্গে বাক্যালাপ তিরস্কার আনয়ন করিয়াছিল, এবং তাড়িত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে এবং আপনার সে কাজের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রচুর প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু সেই মহাশক্তিশালী পুরুষের দীক্ষাগ্রহণের দিন কৌলিক রীত্যনুসারে কলুটোলার সেন বংশের কুলগুরু বংসরান্তে গৃহের পরিজনবর্গকে দীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইলে, গৃহের বয়স্ক বালকগণের দীক্ষার অনুষ্ঠান হইল। পূর্ব্বদিন বালকগণকে একত্র করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল। দলের মধ্যে কেশবচন্দ্রও ছিলেন। তিনি অতি শান্তপ্রকৃতির যুবক ছিলেন। অতি ধীরভাবে অভিভাবক ও গুরুসমীপে নিজের আপত্তি জ্ঞাপন করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া উচ্চ আদর্শের পথে

পদার্পণ করিতে অগ্রসর, এমন সময়ে পরিবারে দীক্ষার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে অভিভাবকগণ বাড়ীর যুবকগণকে কৌলিক ধর্ম্মের আচার আচরণে নিষ্ঠাবান করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন, এমন দিনে এমন সময় কেশবচন্দ্রের দীক্ষা প্রত্যাখ্যান যে কি ভয়ানক সাহসিকতা, ইহাতে সে পরিবারে যে কি একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, তাহা কি আপনি অবগত নহেন? সে দিন সেই রাত্রিতে অভিভাবকগণ যে কেশবের মুণ্ডপাত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা কি আপনি অবগত নহেন? সে দিন এবং তৎপরদিন প্রাতঃকালে নবেন্দ্র নাথ প্রভৃতি সকলে স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া গুরুসমীপে উপস্থিত হইতেছেন, কেশবের দেখা নাই, তিনি বাহিরের ঘরে একাকী শান্তভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া যখন অভিভাবক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে বল পূর্ব্বক দীক্ষার স্থানে লইয়া যাইবার জন্য বল প্রয়োগে উদ্যত, তখন যে ভগবান স্বয়ং কেশবের উদ্ধার সাধনে অগ্রসর হইয়া গুরুমুখে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং গুরুর দ্বারা বলাইয়াছিলেন যে, "এরূপ পীড়ন পূর্ব্বক দীক্ষা দেওয়ায় উত্তম ফল হয় না, আমি ইহার বিরোধী, এবৎসর থাক, বালককে আগামী বৎসর দীক্ষা দিলেই হইবে, উহাকে সময় দাও।"

আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এ সংবাদ অবগত নহেন? এই সুবৃহৎ ঘটনাটীর অন্তরালে যে আরও গুরুতর ব্যাপার লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া গেল, তাহাতেও কি আপনার দৃষ্টি পড়িল না? আশ্চর্য্য বটে! আপনি মহর্ষি মহোদয়ের যে সকল মহদ্‌গুণের পরিচয় পাড়িবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কেশবচন্দ্রের দীক্ষা গ্রহণের অনুরোধে সেই মহর্ষিরই যে একটা অনন্তসাধারণ গুণপনার পরিচয় বিদ্যমান, তাহাও কি লক্ষ্য করেন নাই? তবে ইতিহাস লেখা কেন? কেশবচন্দ্র গৃহে দীক্ষার আয়োজন দেখিয়া চিন্তিত হৃদয়ে দেবেন্দ্রনাথ সদনে উপস্থিত হইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মহর্ষি ব্রহ্মানন্দকে কি পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাও কি আপনি পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না, ইহা কি আপনার নিকট নূতন সংবাদ? আপনি বলেন নাই, আমিই বলিয়া যাই। মহর্ষি বলিয়াছিলেন, "এরূপ গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া ও নেওয়া নিরাপদ নহে, এরূপ বিষয়ে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রেচ্ছ হওয়া উচিত, আর এরূপ বিষয়ে প্রত্যেকেরই আত্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চলা অবশ্য কর্ত্তব্য।" এরূপ একটা ঘটনায় কেশবের হৃদয়ের শক্তি, আত্মার আগ্রহ পরীক্ষার মহামুহূর্ত্ত আপনি কোন্ প্রাণে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন? আবার গেলেন কোথায়, না যেখানে কেশবের এক বিন্দু অনন্যধানতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে ও আগ্রহের সহিত তাহাই যেখানে যখন সুযোগ পাইয়াছেন লিপিবদ্ধ করিতে, ইহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? যাঁহারা জনমণ্ডলীর উপদেষ্টা ও গুরু, তাঁহাদের এতাদৃশ আচরণ যে অমার্জ্জনীয়, তাহা কি আপনি স্বীকার করিবেন না? আপনার যে সরলতা ও নির্ম্মল নিষ্ঠার ভাব দেখিয়া আমাদের হৃদয় সর্ব্বদা নাচিয়া উঠিত, সে মহাভাব কি এই গাঢ় কলঙ্ককালিমা-কলুষিত পক্ষপাতিতার পক্ষ সমর্থন করে? ইহাই কি আপনার ও আপনার দলের দারুণ দুর্ব্বলতা নহে? এই সুকঠিন ব্যাধির আক্রমণের প্রাবল্যে ধর্ম্ম

বস্তু কি স্থান পায়? যদি সত্যই এ অন্যায়ের প্রতিকারপরায়ণ হইতে প্রযাস পান, তাহা হইলেই বুঝিব যে, আপনার চিরপূজনীয় পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর অশ্রুপাত ও দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ স্বার্থক হইযাছে, নতুবা বুঝিব, দলসর্ব্বস্ব মানবসন্তান না করিতে পারে, এমন কর্ম্মই নাই।

আপনার মত আমরা অনেকেই কেবল ধর্ম্ম লাভের জন্য এবং সেই ধর্ম্মজাত উন্নত সামাজিক জীবন ধারণ করিয়া ধন্য হইব বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজে আসিযাছিলাম, কিন্তু হায়, আজ গভীর মনস্তাপের সহিত বলিতে হইতেছে, ধর্ম্ম ব্যক্তিগত সম্পদ। "ধর্ম্ম-সমাজ" বলিয়া "সোণার পাথর বাটী" কোন দিন কোনও দেশে হয নাই, হইতে পারে না, ধর্ম্মের নামে দল হয়। যেমন নববিধান সাধারণ ইত্যাদি এক একটা দল। আর এই দলের স্বার্থ যতই প্রবল হয়, ধর্ম্ম ধন ততই দূরে পলায়ন করে। আপনি সাধারণ সমাজের প্রধান, আপনার প্রাধান্যের ভিতরে দলের সামান্য ব্যক্তিদিগকে যেরূপ ভাবে বৃহদায়তনবিশিষ্ট করিযা তুলিয়াছেন, সেগুলির নিখুঁত সমালোচনা করিতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু তাহাতে সাধারণ ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্ট অনেক অধিক, তাই সে গুলি এখন হাতে রাখিলাম, আপনার প্রযোজন হইলে আপনাকে সে গুলি জানাইব। আপাততঃ আর দু-একটী মাত্রাত্মক বিষযে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, আশা করি, আপনি সে গুলিও সংশোধন করিবেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের লোকান্তর গমনের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকদিনের মধ্যে কলিকাতার লর্ড বিশপ, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, এই তিন ব্যক্তির আগমন সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের লোকান্তর গমনের পূর্ব্বদিন কি তৎপূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধানগণও তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, এবং সে দলে আপনি ছিলেন, আমিও আপনার সঙ্গে ছিলাম। সেই দারুণ-রোগযন্ত্রণার মধ্যেও কেশবচন্দ্র আপনার প্রতি কিরূপ মিষ্ট ব্যবহার করিযা কত কথা বলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রযাস পাইয়াছিলেন, সেগুলি কি আপনার স্মরণ নাই? সেই শেষ বিদায়কালে, তাঁহার স্নেহ মমতা প্রদর্শন, মিলনের জন্য হৃদয়ের সে ব্যাকুলতা প্রকাশ এবং রোগযন্ত্রণার তীব্রতায বাক্যস্ফূরণে অক্ষমতা নিবন্ধন উপস্থিত সকলের নীরব অশ্রুপ্রবাহ কি আপনার স্মরণ নাই? ১০।১২ জন, দর্শকের ভিতর হইতে আপনাকে ডাকিয়া নিকটে বসাইয়া কত কি বলিবার প্রয়াস পাইলেন, সে হৃদযবিদারক দৃশ্য যদি আপনার স্মৃতিপটে চিরমুদ্রিত না হইয়া থাকে, তবে আর আমার বলিবার কি আছে? আমার আপনাকে এই বলিবার আছে যে, ভারত-আশ্রমের কর্ম্মাধ্যক্ষবিশেষের অবিবেচনা ও তন্নিবন্ধন অধুনা লোকান্তরিত হরনাথ বসু মহাশয়ের সপরিবারে আশ্রম-ত্যাগের বিবরণ ইতিহাসের বিষয় হইল, আর ঐ ভক্ত ও বিশ্বাসী সাধুর শেষ দর্শনলাভ ও বিবিধ বিনয়-সৌজন্য-প্রদর্শন ও তজ্জাত অশ্রুজল ইতিহাসের অঙ্গীভূত হইল না? ইহাই আমার বলিবার বিষয়। আর ভারত-আশ্রমের দোষত্রুটির আলোচনা করা আপনার প্রিয় কার্য্য হইলেও, স্বর্গীয় হরনাথ বসু মহাশয়কে অনবধানতা-বশতঃ যেরূপভাবে চিত্র করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় "নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ" করার মত কাজটী হইযাছে। ভারত-

আশ্রমের ব্যবস্থার দোষ ধরিতে গিয়া হরনাথ বাবুর "দেনা পাওনা" বিষয়ে শৃঙ্খলার অভাব ছিল, এরূপ ব্যক্তিগত সামান্য বিষয়ের আলোচনা দ্বারা মৃতভদ্রলোককে জনসমাজে হেয় করিবার আপনার কি অধিকার আছে? এটাও কি ইতিহাসের বিষয়? তাঁহার জীবিত পুত্রকন্যাগণের পক্ষে এরূপ অসঙ্গত ও অনাবশ্যক আলোচনা কি প্রীতিকর? হরনাথ বাবুর পারলৌকিক আত্মা অবশ্যই এ কথায় বলিবেন "ঈশ্বর আমাকে এরূপ বন্ধুর হাত হইতে রক্ষা কর।" এত ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ঘটনা আপনার ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে যে, সে হিসাবে আপনাদের ও আমাদের সকলের ব্যক্তিগত জীবন আলোচনা করিলে, বোধ হয় আপনাকে ক্ষোভের সহিত বলিতে হয় "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইতে এ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকালের ঘটনা-সকল ভারত-আশ্রমের ঐ সামান্য ঘটনার মানদণ্ডে বিচার ও সমালোচনা করিলে, শিক্ষিত সভ্যসমাজে আমাদের মর্য্যাদা বজায় থাকা ভার হয়। আপনি অনুমতি করিলে আমি তাহাতে সম্মত আছি। আর যদি তাহাতে ব্রাহ্ম-সাধারণের কল্যাণ হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সে কার্য্য করা উচিত।

প্রণত—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যুক্তি-জঞ্জাল।

গত চৈত্রের 'বঙ্গদর্শনে' বাঙ্গালীর অকৃত্রিম বন্ধু ও হিতৈষী বাবু বিপিনচন্দ্র পাল শিক্ষার 'সপিণ্ডকরণ' করিয়াছেন। ইংরাজরাজ ব্রহ্মা সাজিয়া বাঙ্গালীর যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ভারতের শিক্ষিত লোকমত বিষ্ণু সাজিয়া যাহা সযত্নে রক্ষা করিতেছেন, বিপিন বাবু শঙ্কর সাজিয়া তাহা সংহার করিতে ত্রিশূল উত্তোলন করিয়াছেন। প্রলয়ের পূর্ব্বে তিনি যুক্তি-জালের ঘনঘটায় দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন। যিনি তলাইয়া দেখিবেন, তিনিই বুঝিবেন উহা বস্তুতঃ যুক্তি-জঞ্জাল। উহাতে আছে আত্মবিস্মৃতি, নাই আত্মবোধ; আছে অনুকরণ, নাই একীকরণ; আছে ভাষা, নাই উদ্দেশ্য, আছে জড়তা, নাই স্পষ্টতা; আছে কুযুক্তি, নাই সুচিন্তা।

এ শ্রেণীর প্রবন্ধে সারবস্তু কিছু থাকুক, আর নাই থাকুক, উহার অনল-উদ্গারে সমাজে বিষময় ফল উৎপাদন করিতে পারে, সাধারণের চিত্তে ভ্রান্ত-ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারে এবং কুযুক্তি-কুহকে পাঠকের সরল মনে বিকৃত ভাব বদ্ধমূল করিতে পারে। অতএব যাঁহারা শিক্ষাসেবক, সত্যান্বেষী, স্বদেশের শুভানুধ্যায়ী, তাঁহাদের কর্ত্তব্য 'জরবদস্তির লেখাপড়ার' যুক্তিজালের অন্তরালে যে 'জঞ্জাল' প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা উদ্‌ঘাটন করিয়া লোক চক্ষুর সম্মুখে প্রদর্শন করা। এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে আজ আবার যুক্তি-জঞ্জালের আলোচনা করিতে হইল।

আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বল প্রয়োগ করা উচিত কি না, এবং উচিত হইলে তাহার সময় আসিয়াছে কি না, সে সম্বন্ধে আমরা কোন বিচার করা আবশ্যক মনে করি না। 'জরবদস্তির

লেখাপড়ার' লেখকও যুক্তির দ্বারা তাহার কোন সুবিচার বা সুমীমাংসা করেন নাই। কিন্তু তিনি 'ধান ভানিতে যে মহীপালের গীত' গাহিয়াছেন, বিলাতের সহিত ভারতের তুলনায় যে সকল অবাস্তবিক কথার অবতারণা করিয়া বিলাতী সমাজের প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়াছেন, এবং কল্পনা ও অজ্ঞতার বশীভূত হইয়া আমাদের বর্ত্তমান সমাজের যে অপ্রকৃত চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করা আবশ্যক।

'জবরদস্তির লেখা পড়ার' স্থূল স্থূল যুক্তি নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

১। ভারতের লোক-প্রকৃতি ও সমাজ-গঠন বিলাতের লোক-প্রকৃতি ও সমাজগঠন হইতে একান্তই ভিন্ন। ভারতের একটা নিজস্ব সাধনা ও সভ্যতা ছিল এবং আছে, ভারতের জাতীয় জীবনের বিবর্ত্তনে সেই সাধনা ও সভ্যতাকে রক্ষা করিতে না পারিলে অশেষ দুর্গতি হইবে।

২। বিলাতী সভ্যতার মূলমন্ত্র স্বত্ব। ইংরেজিতে ইহাকে রাইট্‌স্ বলে। রাইট্‌স্ আপনাকে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিতেই চায়। অপরের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া, হারাইয়া, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হইয়া যে পূর্ণতর সার্থকতা লাভ করা যায়—রাইট্‌স্ এ উচ্চতর তত্ত্বের সন্ধান রাখে না।

৩। প্রতিযোগিতাই রাইট্‌সের নিয়মাধীন সমাজের বিবর্ত্তনের মূল-সূত্র। সে সমাজে রাজশক্তিকে বা রাষ্ট্রীয়-শক্তিকে সর্ব্বদাই সমাজের ভিতরকার যে সকল লোকের আত্মরক্ষায় সামর্থ্য এখনো জন্মায় নাই, তাহাদিগকে এই সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে রক্ষা করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা দিয়া সেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়, না করিলে সমাজরক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে।

৪। যে সমাজে রাইট্‌স্-এর বা ব্যক্তিগত স্বত্ব স্বাধীনতার এই অদ্ভুত আদর্শ এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেখানে সহজ পারিবারিক স্নেহমমতা এবং অকৃত্রিম সামাজিক সৌহার্দ্দ্যই দুর্ব্বলকে প্রবলের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। সেখানে রাজশক্তিকে বা রাষ্ট্রশক্তিকে এই সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হয় না। পিতামাতা প্রভৃতি পরিবারের জ্যেষ্ঠজনেরাই পরিবারের অক্ষম কনিষ্ঠদিগের রক্ষণাবেক্ষণে ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন ইহাই নিসর্গের নিয়ম। এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম কোনো প্রকারে বাঞ্ছনীয়, এমন কথাও কেহ বলিতে সাহস পাইবেন বলিয়া মনে হয় না।

৫। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন ক্রমশঃই শিথিল হইয়া যাইতেছে। সেদেশে আমাদের দেশের মত একান্নবর্ত্তী পরিবার নাই। (আমাদের দেশে) নিজ নিজ স্বার্থ-প্রেরণাই স্বাভাবিক স্নেহ-মমতাকে অলক্ষিতে সর্ব্বদা দূর করিয়া রাখে। একই পরিবারের অন্তর্গত দুর্ব্বল ও অক্ষমদিগকে পরিবারস্থ সবল ও সক্ষম (?) দিগের ঔদাস্য বা প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার ভার বা তাহাদের ভবিষ্যৎ যোগ্যতা জন্মাইবার জন্য শিক্ষাদীক্ষা দিবার দায় রাজশক্তিকে বা রাষ্ট্রশক্তিকে আপনার হাতে গ্রহণ করিতে হয় না।

৬। মানুষের সহজ স্নেহ-মমতা আপনা হইতে যে কাজ করে, তার জন্য রাজবিধান প্রণয়ন কেবল একান্তই অনাবশ্যক নহে, কিন্তু নিতান্তই অনিষ্টকর।

৭। এখনো আমাদের সমাজে স্বামীর

দৌরাত্ম্য হইতে আপনার সতীত্বকে (?) না হউক; কিন্তু স্বত্বকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু স্ত্রী আদালতের আশ্রয় লইতে অগ্রসর হন নাই, আর পিতা মাতার অত্যাচার হইতে পুত্র কন্যার স্বত্বকে রক্ষা করিবার জন্যও দেশের আইন আদালতকে ক্লেশ পাইতে হয় না। হয় না, বলিয়াই সমাজে এই বিপ্লবের মুখেও অনেকটা আপনার সহজ স্বাভাবিকতাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছে।

৮। এই সময়ে যদি সংস্কারের দোহাই দিয়া রাজ-বিধির বেনোজল খাল কাটিয়া সমাজের ভিতরে ডাকিয়া আনা হয়, তবে এই সহজ স্বাভাবিকতাকে রক্ষা করা আদৌ অসম্ভব হইয়া উঠে।

৯। ভিতরকার প্রবৃত্তির প্রেরণায় (মানুষ) যাহা কিছু করুক না কেন, তাহাতে স্থায়ী অমঙ্গল কখনোই হইতে পারে না।

১০। এমন মন্দ বিধাতার সৃষ্টিতে কিছু নাই, যারও একটা সহজ ভালোদিক নাই। ছায়াতপের ন্যায় জীব ও শিব মানুষের ভিতরে পরস্পরের সঙ্গে নিয়ত মিলিয়া আছে।

১১। মানব-সমাজে সহজ-প্রকৃতিই শিশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছে। পিতামাতাই আপনাদের সন্তান-সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই সহজ নৈসর্গিক নিয়ম। যেখানেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, সেখানেই সমাজ প্রথমে পিতামাতাকে এই সহজ কর্ত্তব্য পালনে অক্ষম করে, ও পরে আপনি আত্মরক্ষার্থে পিতামাতার হাত হইতে এই পবিত্র কর্ত্তব্যভার কাড়িয়া লয়, সেখানে কিছুকালের জন্য আপাততঃ কিছু সুফল ফলিলেও পরিণামে মানুষকে মনুষ্যত্ব-হীন ও সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে।

১২। পরিবারের স্নিগ্ধ-ছায়া হইতে শিশুদিগকে ছিনিয়া নিয়া বোর্ডিং বা বিহারের উষ্ণ হাওয়াতে স্থাপন করিলে ক্বচিৎ কেহ কেহ অসাধারণ উন্নতি লাভ করিতে পারিলেও, তাহাতে সমাজের সাধারণ মনুষ্যত্বটা ক্রমশঃই দুর্ব্বল ও ক্ষয়োন্মুখ হইয়া উঠে। ইত্যাদি। মানুষের প্রাণকে বোর্ডিং বা বিহারের স্কুল বা চতুষ্পাঠীর টবে পুঁতিয়া সজীব রাখা ও সতেজ করা যায় না। বোর্ডিং বা বিহারকে যতই যত্ন করিয়া শিশুদের বাড়ীর মত সুখকর ও, প্রীতিকর করিবার চেষ্টা করিবে এবং যে পরিমাণে সে চেষ্টা ফলবতী হইবে, ততই, সে পরিমাণে ছেলেদের নিজেদের বাড়ীর টানটা কমাইয়া পরিবারের সহজ-স্নেহ-মমতার বন্ধনগুলিকে শিথিল করিয়া তাদের জীবনে পরার্থপরতার মূল ভিত্তিটাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিবেই ফেলিবে। এরূপ শিক্ষায় আপনার জনকে পর করিয়া দেয়, আর পরকে আপন করিতে চায়। ইহার ফলে একটা কৃত্রিম, কল্পিত, বিমানচারী, স্বাদেশিকতা বা বিশ্বপ্রেমের মায়িক সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু মানুষ যখনই সংসারে নির্ম্মম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিষ্পেষিত হইতে আরম্ভ করে, তখন এই ভিত্তিহীন লোক-হিতৈষা বা বিশ্বপ্রেম তাহাকে আপনার অতি হীন ও হেয় স্বার্থের টান হইতে রক্ষা করিতে পারে না। ইত্যাদি।

১৩। যে সার্ব্বজনীন শিক্ষা এদেশে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য একদল অধীর সংস্কারক রাজশক্তির শরণাপন্ন হইয়াছেন, সেই সার্ব্বজনীন সাধারণ শিক্ষাতেও পরিবার-বন্ধনকে ক্রমেই শিথিল করিয়া দিতেছে। য়ুরোপীয় সমাজে স্বাভাবিক স্নেহের ও সাংসারিক স্বার্থের অপূর্ব্ব সমাবেশ হয় নাই, সেখানে মানুষের স্বাভাবিক স্নেহকে সংসার বুদ্ধিতে

আপনা হইতেই বাড়াইয়া তোলে না। আর স্বাভাবিক স্নেহও সেখানে সংসার-বুদ্ধিকে না জাগাইয়াই তৃপ্ত করিতে পারে না (!!)।

১৪। যুরোপের সমাজ-গঠনই এরূপ যে সেখানে পিতা ও পুত্রের, মাতা ও কন্যার মধ্যেও একটা অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার ভাব অন্তঃসলিলের মত লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনারও অজ্ঞাতসারে ভিতরে ভিতরে জাগিয়া রহে। জোর করিয়া সকলকে স্কুলে আনিয়া যে লিখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা সেদেশে প্রবর্ত্তিত আছে, ক্রমশঃই তাহাতে এই ভিতরকার প্রতিযোগিতাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া পারিবারিক জীবনের সহজ-স্নেহ-মমতার সম্বন্ধগুলিকে শ্লথ করিয়া শিক্ষার নামে মনুষ্যকে একান্তভাবে নষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে।

১৫। গরীব পরিবারে সর্ব্বত্রই সাত আট বৎসরের ছেলেমেয়েরাও সংসারের কার্য্যের অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাদিগকে জোর করিয়া স্কুলে পাঠাইলে তাহাদের (ক) পরিবার এই সাহায্যটুকু হইতে বঞ্চিত হয় ও তাহাদের দারিদ্র্য-ক্লেশ আরো বাড়িয়া উঠে।

(খ) অন্যদিকে তাহাদিগকে যথাসময়ে ধুইয়া পুছিয়া, খাওয়াইয়া পরাইয়া স্কুলে পাঠাইতে হয় বলিয়া তাহাতে সংসারের খরচ আরো বাড়িয়া যায়।

(গ) এই কঠিন সমস্যায় পড়িয়া অনেক দুঃস্থ জনক জননী স্কুল ছুটী হইলে ছেলেদিগকে অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত করিয়া থাকে। বেচা-কিনা রাত্রে দুপয়সা ঘরে লইয়া না আসিলে পিতামাতার নিকট শাস্তি পাইয়া থাকে।

(ঘ) এ অবস্থায় একদিক দিয়া শিশু-দিগের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

(চ) অন্যদিকে পিতামাতার ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে স্বাভাবিক স্নেহ ও ভক্তির সম্বন্ধটা একেবারেই ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয়।

(ছ) সার্ব্বজনীন সাধারণ-শিক্ষার প্রচলনে স্নেহ ও স্বার্থের মধ্যে এই নিত্য বিরোধটাকে আরো ফুটাইয়া ও বাড়াইয়া তুলে। ইহা দ্বারা কখনই সমাজের কল্যাণ হইতে পারে না।

১৬। জনগণকে আপনাদের স্বত্ব ও অধিকার বুঝিবার ও রক্ষা করিবার সামর্থ্য প্রদান করাই এই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, আর নিজ নিজ স্বত্ব ও অধিকার বোঝার অর্থই নিজ নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে ভালো করিয়া সজাগ ও সচকিত হওয়া। যতই জনগণ মধ্যে এইরূপ স্বার্থ প্রবল হইয়া উঠে, ততই সমাজমধ্যে বিভিন্ন লোক ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়া চলে। ইহাতে মনুষ্যত্বের হানি হয় ও সমাজে বিপ্লব আসিয়া পড়ে।

১৭। আমরাও কি শিক্ষাবিস্তারের নামে দেশোন্নতির দোহাই দিয়া এই সাংঘাতিক ব্যবস্থাকে দেশে প্রচলিত করিব, যে সমাজ চিরদিন জগতে পরার্থপরতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার বুকে এই আত্মঘাতী স্বার্থানুসন্ধানকে প্রতিষ্ঠিত করিব, এই বিষম কুশিক্ষা অপেক্ষা আমাদের বর্ত্তমান অশিক্ষাই কি অশেষগুণে ভাল নয়?

এই প্রবন্ধ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে ইহাতে সত্যের ও অসত্যের, সুযুক্তির ও কুযুক্তির এরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অন্যত্র বিরল। স্থানে স্থানে মতবিরোধ এবং উক্তিবিরোধেরও অভাব নাই। একদেশদর্শিতা পূর্ব্বাপর সমস্ত

যুক্তি-জঞ্জালের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। স্বয়ং লেখক ভিন্ন আর কেহ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে পারেন কি না সন্দেহ। ইংরাজী ভাব অনুকরণ করিতে যাইয়া স্থানে স্থানে ভাষা এরূপ জটিল ও অস্পষ্ট হইয়াছে যে, তাহাতে বাঙ্গালী পাঠকের সহজে দন্তস্ফুট হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বিলাতের শ্রমজীবি সম্প্রদায় এবং সামাজিক বিপ্লববাদিগণের মত হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা ইংরাজী সাহিত্য ও সাময়িক পত্রাদির সহিত সংশ্রব রাখেন, তাঁহাদের নিকট লেখকের চমৎকারিনী যুক্তির অধিকাংশই নূতনত্বহীন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা একটু সংস্কার ও পরিবর্ত্তন বিরোধী এবং সংরক্ষণশীল, তাঁহারা হয়ত এই প্রবন্ধে ভাবের নূতনত্ব ও ভাষার চটক দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন, অপরিহার্য্য যুগ-পরিবর্ত্তনের ফল পাশ্চাত্য প্রভাব, শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবেন। ফলে হয়ত দেশে অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে, কতক পরিমাণে লোকের সুখশান্তিতে আঘাত পড়িবে, এবং যে ইংরাজী সভ্যতা ও সময়োচিত পরিবর্ত্তন মস্তক পাতিয়া গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই, তাহার প্রতি লোকের বিরাগ সৃষ্টি হইয়া অভিনব বিপ্লবের সূত্রপাত হইবে। যাঁহারা বিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত, তাঁহাদের কর্ত্তব্য সংসারের দুঃখভার লঘু করিবার চেষ্টা করা। তাঁহাদের উচিত, যাহাতে মানুষের মনে সন্তোষ ও শান্তি বিরাজ করে, তাহার বিধান করা, এবং মানুষকে আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে উপদেশ দেওয়া দেশের অগ্রণী ব্যক্তিরা যদি কাল্পনিক অসন্তোষের বীজবপন করিয়া সংসারের দুঃখভার বৃদ্ধি করিতে ব্যস্ত হন; তবে তাঁহাদের শিক্ষার মূল্য কি, তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন।

যে সকল যুক্তি-বলে প্রবন্ধ-লেখক স্বীয় মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা করা যাউক।

১। বিপিন বাবু বলিয়াছেন, ভারতের লোক-প্রকৃতি ও সমাজগঠন বিলাতী লোক-প্রকৃতি ও সমাজ-গঠন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঐ প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, "মানুষের প্রকৃতি আমাদের দেশে যেমন মোটের উপরে য়ুরোপেও সেইরূপই।" (৭২৩ পৃঃ) এই উভয় উক্তির সামঞ্জস্য কোথায়? ভারতের লোক-প্রকৃতি ও সমাজগঠন বলিয়া একটা নিখুঁত জিনিস বাজারে কিছু আছে কি? বাঙ্গালীর প্রকৃতি, পাঞ্জাবীর প্রকৃতি, বিহারী ও মধ্য ভারতবাসীর প্রকৃতি, গুর্খা রাজপুতের প্রকৃতি, আকা-আহোম-আরবলেপ্‌চার প্রকৃতি, মোগল-পাঠানআফ্রিদীওয়াজিরী প্রকৃতি, শিখ বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবপ্রকৃতি, আদি-ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ সমাজ, ও নববিধান সমাজের প্রকৃতি, বিলাত-প্রত্যাগত ও গৌড়া তান্ত্রিক প্রকৃতি প্রভৃতির সমন্বয় করিয়া তিনি ভারতের যে সাধারণপ্রকৃতি পাইয়াছেন, তাহার সহিত তিন চারি শতাব্দী পূর্ব্বেকার ইংরাজী, ইতালীয়, স্পেনীয়, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, রুষ, জর্ম্মান প্রভৃতির সমাহার-প্রকৃতির তুলনা করিয়া তিনি কি সূক্ষ্ম বিশেষত্ব ধরিতে পারিয়াছেন, উল্লেখ করিলে সুখী হইতাম। ভারত ইয়োরোপ হইতে তিন চারি শত বৎসর পশ্চাতে রহিয়াছে। অতএব বর্ত্তমান ভারত বুঝিতে হইলে কোন সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশের তিন চারি শতাব্দী পূর্ব্বের অবস্থার সহিত তুলনায় বুঝিতে হইবে। নব্য-বিজ্ঞান, নব্য চিন্তা ও কার্য্যপ্রণালী, বর্ত্তমান সভ্যতা

ও উন্নতি আধুনিক যুগের ফল। প্রাচীন সভ্যতায় ভারত, মিশর, চীন, ক্যালডিয়া প্রভৃতি যেমন শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া জগতের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল, আধুনিক সভ্যতায় তেমনি ইয়োরোপ ও তাহার জ্ঞাতি-ভাই আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর পরিচালক হইয়াছে। আমরা কৃত্রিম বা অকৃত্রিম নাসিকাকুঞ্চন করিলেও, তাহারা আমাদের চক্ষুশূল হইলেও, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সূর্য্যের আলোকের ন্যায়, মুক্ত বাতাসের ন্যায় বন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া, নব্য-সভ্যতা আমাদিগকে অধিকার ও আচ্ছন্ন করিবে। হিমালয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভারতমহাসাগর পার হইয়া প্রতীচ্য প্রভাবে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। আমরা এখন প্রাচীর-বেষ্টিত দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া, আপন ভাবে বিভোর হইয়া, জগতের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন-করিয়া মহাযোগীর ন্যায় ধ্যানমগ্ন থাকিলেও আমাদের রক্ষা নাই। বিলাতীজীবনের সংস্পর্শ আমাদিগকে কেশাকর্ষণ করিয়া জাগরণের পথে লইয়া যাইতেছে। আমাদিগকে এখন জার্ম্মানীর হাটে কিনিতে হয়, ইংলণ্ডের বাজারে বেচিতে হয়। আমাদিগকে এখন জগতের সকল দেশের সহিত আদানপ্রদান ক্রয়বিক্রয় করিতে হয়। আমাদের কৃষক, শ্রমজীবী ও বণিকদিগকে ব্রহ্মাণ্ডের কৃষক, শ্রমজীবী ও বণিকগণের সহিত অন্নের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। এ অবস্থায় তোমার আমার ক্ষীণ কণ্ঠ তাহাদিগকে বিরত হইতে উপদেশ দিলে তাহারা শুনিবে কি? তাহাদের আভ্যন্তরিক প্রয়োজন তাহাদিগকে যুক্তি-জঞ্জালের মোহ ভাঙ্গিয়া আত্ম-রক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবে।

বিপিন বাবু স্বীকার করেন, ভারতের জাতীয় জীবনের বিবর্ত্তনে ভারতের নিজস্ব সাধনা ও সভ্যতাকে রক্ষা করিতে হইবে। ভারতের নিজস্ব রক্ষা করিতে হইবে, তাহা কেহ অস্বীকার করেনা। অবস্থার পীড়নে যতটুকু রক্ষা করা যায়, তাহা প্রকৃতি আপনা হইতে বাঁচাইয়া যাইবে। শিক্ষার বেলা 'প্রকৃতি ও আভ্যন্তরিক প্রয়োজন মানিতে' হইবে, জাতীয়তা রক্ষার বেলা তাহা বাদ দিলে চলিবে কেন? গৃহের দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়া বিলাতের শিক্ষা ও সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিলে "জাতীয় জীবনের বিবর্ত্তন"ইবা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? মান্ধাতার আমল হইতে যেরূপ যাহা চলিয়া আসিতেছে, চিরদিন তাহাই অটল, অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকিবে। বিপিন বাবু কি আশঙ্কা করেন যে বিলাতী মাল, বিলাতগমন, বিলাতীধর্ম্ম, বিলাতীলোকের সংস্পর্শ, বিলাতী সভ্যতা, বিলাতী বাণিজ্য, বিলাতী আইন আদালত ভারতের যে 'নিজস্ব সাধনা ও সভ্যতা' অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তাহা কি কেবল খাঁটি ভারতীয় প্রণালীতে 'ক, খ' শিক্ষা দিলেই বালির বাঁধও সলিলুরেখার ন্যায় বিলুপ্ত হইবে?

২। বিলাতের লোকেরা অপরের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া হারাইয়া তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হইয়া পূর্ণতার সার্থকতা লাভ করিতে জানে না। এরূপ উক্তি অত্যন্ত সাহসের কথা। যাঁহারা বিলাত জানেন এবং ভারত জানেন, তাঁহারা এরূপ উক্তি সমর্থন করিবেন না। বিলাতের আদর্শে আমরা মানুষ হইতেছি। বিলাতের লোক চার্লস্ দি প্রিটেণ্ডারকে ধরাইয়া দেয় নাই, ভারতের লোক কি করিত বলিতে

পারি না। বিলাতের লোক ছিলেন হাওয়ার্ড, ফাদার দামিয়েন, মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। এখনও বিলাতের লোক শত, শত পৃথিবীর কত অংশে নীরবে দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া কাননের কুসুমের ন্যায় আপনি ফুটিয়া গোপনে বাস বিলাইয়া লোকচক্ষুর অগোচরে কর্ত্তব্যের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতেছেন, তাহার সংখ্যা কে রাখে? সার ওয়াল্টার স্কট্ সারা জীবন পরিশ্রম করিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় মিঃ কেন্ স্বোপার্জ্জিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া, যে কোম্পানীর সহিত তাঁহার নামের যোগ ছিল, তাহার ঋণভার বহন করিয়াছিলেন। আর আমাদের দেশে কত মহাপুরুষ আছেন, যাঁহারা টাকা ধার করিয়া পরিশোধ করিবার চেষ্টা না করিয়াও, দশের কাছে মুখ উঁচু করিয়া কথা বলিতে লজ্জা বোধ করেন না। বিলাতের লোক কেমন করিয়া পরের জন্য আপন প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারে, তাহা শিক্ষিত পাঠকদিগকে বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। বার্কেন হেড ও টিটানিক প্রভৃতি যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছে, তাহা বহু যুগ পর্য্যন্ত ভারতকে শিক্ষা দিতে পারিবে।

স্বত্ব বা রাইটস্ বিলাতী সভ্যতার মূল মন্ত্র নহে, উহা মানব প্রকৃতির স্বধর্ম্ম। ইয়োরোপে, এসিয়ায়, আমেরিকায়, নিউজিলাণ্ডে সর্ব্বত্রই ঐ কথা। মানব প্রকৃতি রক্ষা করিয়া বিলাতী সভ্যতা ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করিতেছে। আমরা ব্রহ্মণ্যের পীড়নে, শাস্ত্রের তাড়নায়, পরাধীনতার নিষ্পেষণে, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবে স্বভাব হারাইয়া, প্রকৃতি-ভ্রষ্ট হইয়া, মেষের ন্যায় আপনা ভুলিয়া পরের সহিত একাত্ম হইতে শিখিয়াছি। কিন্তু কেহ যদি আমাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন, আমরা কত স্বার্থপর, কত স্বত্বান্বেষী, কত পরশ্রীকাতর, কত আত্মম্ভরী, কত ঘৃণিত, 'ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি।'

৩। প্রতিযোগিতাই রাইটস্‌এর নিয়মাধীন সমাজের বিবর্ত্তনের মূল সূত্র ইত্যাদি। আমরা বিপিন বাবুর সহিত একমত হইয়া বলি, প্রতিযোগিতার জন্য উপযোগী করিতেই আমাদের নিরক্ষর প্রজাদিগকে অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক। আমাদের শ্রমজীবিগণকে এখন জগতের শ্রমজীবিদিগের সহিত দারুণ জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করিতে হইতেছে। উপযুক্ত শিক্ষা না দিলে তাহারা কালচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে তিরোহিত হইবে।

৪। এক্ষেত্রে বিপিন বাবু ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে যেরূপ অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, কোনও বিলাতী ভ্রমণকারী বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত তাহা অপেক্ষা অধিকতর অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের দেশে স্বত্ব স্বাধীনতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তথাপি আমাদের দেশে স্বামীর অত্যাচার হইতে স্ত্রীকে, পিতার অত্যাচার হইতে পুত্রকে, ভ্রাতার অবিচার হইতে ভ্রাতাকে রক্ষা করিবার জন্য আইন কানুনের প্রয়োজন হইয়াছে, আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা হইতেছে। মনুসংহিতার বিধি ব্যবস্থায় সামাজিক শাসন ও রাজার কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহা কি বিনা প্রয়োজনে রাহির হইতে চাপান বোঝা?

মুসলমান রাজত্বে রাজার হাত হইতে সমাজ কর্ত্তব্যভার অনেক পরিমাণে স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইংরাজ

রাজত্বের সুশাসনে অবসন্ন সমাজ পুনরায় রাজার হস্তে সেই সকল অধিকার প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। রাজা ও রাজবিধান কিম্বা শাসনবিধি বাদ দিয়া যে সমাজ ও সভ্যতা কল্পনা করা যায়, তাহা কৃত্রিম ও অঙ্গহীন। সে কেবল মধু অভাবে 'গুড়ম্'। হাইকোর্টের, পুলিশকোর্টের ও জেলাকোর্টের ফৌজদারী, দেওয়ানী মকদ্দমার তালিকার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে বিপিন বাবু বুঝিতে পারিবেন, আমাদের দেশে কেমন "অকৃত্রিম স্যাম্যাজিক সৌহার্দ্দ্য।" তিনি স্বদেশে, আত্মীয়-স্বজনের সংস্পর্শে, স্বপরিবারে শৈশবে হিন্দু-সমাজে এবং পরে ব্রাহ্মসমাজে যাহা দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন এবং ভুগিয়াছেন, তাহা মনে রাখিলে নিসর্গের ব্যতিক্রম বাঞ্ছনীয় কিনা বলিতে সাহসী হইতেন। কোনও বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, একবার তিনি আগরতলায় এক কুকীরাজের সহিত দেখা করিতে তাঁহার শিবিরে গিয়াছিলেন। তথায় যাইয়া দেখেন যে, রাজা স্বাভাবিক *পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কয়েকজন অমাত্যের* সহিত নিসর্গের আসনে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। বন্ধু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে রাজা হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন, আসুন, কিছু মনে করিবেন না, আমি স্বদেশী পোষাকে রহিয়াছি।' বিপিন বাবুর কি ইচ্ছা যে, আমরা সকল প্রকার সভ্যতা ও Conventionalism ত্যাগ করিয়া নিসর্গের আশ্রয় গ্রহণ করি?

৫। বিপিন বাবু ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে *পাশ্চাত্য-প্রণালীতে পিতৃস্নেহে ও মাতৃস্নেহে* স্বার্থ আরোপ করিয়া দার্শনিক ব্যাখ্যা সমাধা করিয়াছেন। এরবেলা প্রকৃতির আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রতীচ্য বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি আর একটু অগ্রসর হইলে বুঝিতে পারিতেন, আদিম অবস্থায় মানুষকে সকল কাজ নিজে করিতে হয়। তখন এক একটী পরিবার এক একটী রাজ্য। ক্রমে কয়েকটী পরিবার লইয়া একটী সমাজ ও পল্লীর সৃষ্টি হয়। তখন মানুষ কতক স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া অপরের সাহায্য গ্রহণ করে। ক্রমে সমাজের মিলিত শক্তি সাধারণের সেবায় নিযুক্ত হয়, তখন যাহা ব্যক্তির কর্ত্তব্য, তাহা সমষ্টির কার্য্য বলিয়া মনে করা হয়। এইরূপে ক্রমে সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পিতার অধিকার রাজার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। পিতা পরিবারের কর্ত্তা, রাজা সমস্ত দেশের ও সমাজের কর্ত্তা। পিতা কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে রাজা দণ্ডহস্তে উপস্থিত হইবেন, রাজা কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে প্রজা আইনে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবে। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে রাজা কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলে প্রজা চক্ষের জল ও দীর্ঘনিশ্বাস লইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিত। যাহা হউক, এই নিয়মের অধীন হইয়া *আমাদের দেশেও* পুরাকালে রাজা প্রজার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন—

প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্ম হেতবঃ॥

৬। মানুষের স্নেহ-মমতা আপনা হইতে যে কাজ না করে, তাহার জন্য রাজ-বিধান প্রণয়ন একান্তই আবশ্যক ও সমাজের কল্যাণকর। বিপিন বাবু ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখিতে পাইবেন, আমাদের দেশে রাজপুত প্রভৃতি পশ্চিম ভারতীয় জাতিরা কিরূপ নিষ্ঠুর *ভাবে স্বহস্তে আফিং প্রয়োগ করিয়া কন্যা*-সন্তানদিগের প্রাণসংহার করিত। কেরী সাহেব প্রণীত জন কোম্পানীর পুরাতন ইতিহাসে, বার্ণিয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, কাক্রর মানু-

যীতে এবং অন্যান্য বহু পুস্তকে সতীদাহের যে বীভৎস চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে,তাহাতেও পাল মহাশয়ের তথা-কথিত স্নেহ-মমতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যখন বাঙ্গালার সুন্দর বনে পিতা ঔরসপুত্রকে গাজীর বাঘের মুখে ছাড়িয়া দিয়া আসিতেন, মাতা পুত্র-কন্যা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিতেন, তখন "সহজ স্নেহ মমতা" কি কৈফিয়ৎ দিত? এখনও কত জননী গোপনে উদরস্থ সন্তানের বিনাশ সাধন করিয়া মনে শান্তি লাভ করেন। রাজ-বিধান প্রথমে এ সকল স্নেহ-মমতার ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যে হস্তক্ষেপ করে নাই। পরে কেবল সাবধান করিয়া দিয়া ইঙ্গিতে ইশারায় আমাদের এই সকল প্রকৃতিগত কুপ্রথা দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল, আরক্ত শাসন ও ভীম দণ্ড ব্যতীত কিছুতেই এই কলঙ্ক দূর হইবার নহে, তখন বিপিন বাবুর সম্মানিত পূজনীয় রামমোহন প্রভৃতি আমাদের দেশের মুখপাত্রদিগের সাহায্যে রাজ-বিধান সমাজ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। বিপিন বাবুর হয়ত মনে নাই, সহবাস-সম্মতি-আইন করা-ইবার সময় সমাজ বাধা প্রদান করিলেও কিরূপে জোর জবরদস্তি করা হইয়াছিল, এবং এল্‌বার্ট হলে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া কত অতীতে রাজ-বিধির সমর্থক এবং বর্ত্ত-মানে সহজপ্রকৃতিপোষককে পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিয়া গৃহে যাইতে হইয়াছিল।

৭। বিপিন বাবু একটু রসিকতা করিয়া-ছেন 'এখনো সমাজে স্বামীর সৌরাত্ম হইতে আপনার সতীত্বকে (?) না হউক,কিন্তু স্বত্বকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু স্ত্রী আদালতের আশ্রয় লইতে অগ্রসর হয় নাই'—ইত্যাদি। এ বিষয়ে আর নূতন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। উপরে যে সকল কথা লেখা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। এরূপ অলীক, অসত্য ও অন্ধ উক্তি প্রকাশ্য কাগজে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি করিতে পারেন বলিয়া পূর্ব্বে ভাবিতাম না। খোরপোষের দাবীর মোকদ্দমা এবং স্ত্রী হত্যার মোকদ্দমা হিন্দু সমাজের যে চিত্র প্রকাশ করে, তাহা উল্লেখ না করাই শ্রেয়ঃ। হিন্দু সমাজই ভারতীয় সমাজ নহে, এ কথাও পাঠকদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা, খ্রীষ্টান মিশনরী এবং ব্রাহ্ম-সমাজ আমাদের সমাজের যে কত ক্লেদ ধৌত করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

৮। ভবতি বিজ্ঞতনঃ ক্রমশোজনঃ। এমন সোণার বুদ্ধি সহবাসসম্মতির আইনের সময় পাল মহাশয়ের কোথায় ছিল?

৯। ভিতরকার প্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ যাহা কিছু করুক না কেন, তাহাতে তার স্থায়ী অমঙ্গল কখনই হইতে পারে না, ইহা অনাদ্য সত্য। চুরি, ডাকাতী, বাটপাড়ী, জাল, জুয়াচুরী, ব্যভিচার, খুন, দাঙ্গা,স্বেচ্ছাচার সমাজে অবাধে চলুক। আইন করিয়া মানুষের ভিতরকার প্রবৃত্তি দমন করিয়া কাজ নাই। শিশুকাল হইতে তাড়না করিয়া, পাল মহাশয়ের পিতামাতা ভুল করিয়াছিলেন। সদুপদেশ দিয়া ও সদাচরণ শিখাইয়া প্রয়োজন কি? আভ্যন্তরিক শক্তি আন্তরিক প্রেরণায় স্বাধীন ভাবে ক্রীড়া করিতে থাকুক। শক্তিকে সংযত করিয়া কর্ত্তব্যের পথে পরিচালন না করিলে,সে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল অশ্বের ন্যায় আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে যে। আশৈশব আমাদিগকে শিক্ষার অধীন হইয়া স্বভাব সংশোধন করিতে হয়। সামাজিক জীবনের ইহাই প্রকৃতি।

১০। এই মন্তব্য সভ্যতা ও শিক্ষার প্রতি প্রযোগ করিয়া তাহার ভালমন্দ,আলো আঁধার, এই দুইদিক বিবেচনা করিয়া তুলনায় গুণাগুণ বুঝিলে বিপিন বাবুকে এক ক্লেশ পাইতে হইত না। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ভিতরেও শিব ও অশিব 'ছায়াতপের' (Light and shadeএর অনুবাদ নয় কি?) ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরের ছেলেকে 'ড্যাক্‌সা,' 'মিন্‌সে' বলিয়া নিজের ছেলেকে 'সোণা', 'যাদু' বলিলে চলিবে কেন?

১১। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, সমাজের, আদি অবস্থায় মানুষ যাহা কিছু প্রয়োজন নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লয়। একই ব্যক্তিকে স্বপরিবারে পুরোহিত, যোদ্ধা, কৃষক,দীবর, ব্যাধ, তন্তুবায়, শিল্পী প্রভৃতি সকলের কার্য্য করিতে হয়। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে Division of Labour (কার্য্য বিভাগ) আরম্ভ হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও তাহাই। পারিবারিক প্রয়োজন যত অধিক হইবে, সভ্যতা যত জটিল হইবে, ততই কার্য্য-বিভাগের আবশ্যকতা বাড়িবে। এইরূপে বহু লোকের একত্র মিলনে টোল, পাঠশালা, মক্তব, বিদ্যালয় ও স্কুল কলেজের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা আজ হয় নাই, সুদূর অতীতে ভাবতে হইয়াছিল, এক্ষণ সভ্যতার কেন্দ্র বিলাতে হইয়াছে। ইহাতে মানুষ মনুষ্যত্ব হারায় না, সমাজও বিপর্য্যস্ত হয় না, কিন্তু সভ্যতার প্রসারে 'প্রকৃতির আভ্যন্তরিক প্রেরণা' প্রয়োজন অনুসারে আপনার পথ বাহির করিয়া লয় মাত্র।

১২। পরিবারের স্নিগ্ধ ছায়া হইতে শিক্ষার জন্য কঠোর স্কুল-কলেজ বা বোর্ডিং শাসনে দিলে সমাজের সাধারণ মনুষ্যত্ব লোপ পায়, এরূপ কথা অশোকের নিকট কেহ বলিলে তাহার নাম শিলালিপিতে অক্ষয় হইয়া থাকিত। রাম, কৃষ্ণ, পাণ্ডব, কৌরব সকলকেই শিক্ষার জন্য আচার্য্য গৃহে যাইতে হইত। কুলপতিগণ প্রত্যেকে দশ সহস্র শিষ্যকে অধ্যাপনা করিতেন। ধ্রুবের শিক্ষা ও প্রহ্লাদের শিক্ষা পরিবারের স্নিগ্ধ ছায়াতে হয় নাই। ক্ষত্রিয় কুমারগণ কঠোরতার মধ্যে গুরুগৃহে শিক্ষা লাভ করিতেন। গৃহে যাহার উপযুক্ত বন্দোবস্ত হইতে পারে, তাহাকে স্কুল কলেজে এবং বিদ্যালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন কি? কিন্তু দশজনের সঙ্গে বসিয়া একত্র মিলিয়া মিশিয়া যে একটী নূতন শিক্ষা হয়, তাহা গৃহে সম্ভবপর নহে। মনুষ্যত্ব শিক্ষা কেবল গৃহে বসিয়া পৈতৃক ধন উড়াইয়া দিবার জন্য নহে, সংসারে অপরের সহিত তীব্র জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ ও সামাজিকতা শিক্ষার জন্য। বিপিন বাবু আমাদের দেশের দরিদ্র কৃষক, ও দিনমজুরদিগের গৃহে যে স্নিগ্ধ ছায়ার স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বিলাতের লোকেরা তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিবে। বিপিন বাবু নিশ্চিন্ত থাকুন, জননীর ক্রোড হইতে ছিনাইয়া লইয়া কঠোর শিক্ষার জন্য শিশুদিগকে বিদ্যালয়ের কারাগারে ভরিবার কিছু আবশ্যকতা হইবে না। স্নিগ্ধ ছায়ায় মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না—রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, ঝড়ের সহিত লড়িয়া মানুষ মানুষ হয়। মেসে থাকিয়া উৎসন্ন যাওয়া অপেক্ষা বোর্ডিং বা বিদ্যালয়ের কঠোর শাসন মঙ্গলজনক নহে কি? যদি তাহাই না হইবে, তবে প্রতি বৎসর স্থানাভাবে বোর্ডিংএর এত দরখাস্ত নামঞ্জুর হইতেছে কেন?

"ইহার ফলে একটা কৃত্রিম, কল্পিত, বিমানচারী স্বাদেশিকতা বা বিশ্বপ্রেমের মায়িক সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু মানুষ যখনই

সংসারে নির্ম্মম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিষ্পেষিত হইতে আরম্ভ করে, তখন এই ভিত্তিহীন লোক-হিতৈষা বা বিশ্বপ্রেম তাহাকে আপনার অতি হীন ও হেয় স্বার্থের টান হইতেও রক্ষা করিতে পারে না।" ভাষা মাধুর্য্যে বোধ হইতেছে, এই টুকু বিপিন বাবুর জীবনে পরীক্ষিত প্রাণের কথা।

১৩। লেখক আধুনিক সভ্যতার ফল শিক্ষার প্রতি আরোপ করিয়া, বাতাসের গালায় দড়ী দিয়া, একটা অনর্থক বাগ্‌জালের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি সেই Village Pedagogueএর ন্যায় 'Though vanquished would argue still' ইহাতে আমাদের নূতন কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু শেষাংশের প্রতি পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না—

"সেখানে মানুষের স্বাভাবিক স্নেহকে সংসার বুদ্ধিতে আপনা হইতেই বাড়াইয়া তোলে না। আর স্বাভাবিক স্নেহও সেখানে সংসার বুদ্ধিকে না জাগাইয়াই তৃপ্ত করিতে পারে না।"

১৪। ইয়োরোপের সমাজ গঠনের যাহা বিশেষত্ব, তাহা শিক্ষার স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ এই প্রতিযোগিতা ইয়োরোপের সমাজগঠনের বিশেষত্ব কি ভারতীয় সমাজের নিজস্ব, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। ভারতীয় সমাজ বলিতে হিন্দু, মুসলমান, ধনী, দরিদ্র, বাঙ্গালা, বেহার, এটা সেটা, বাছিয়া বাদ দিয়া অভিপ্রায় মত ২।৪ জন বলিলে চলিবে না। আরঙ্গজেব, সেলিম, সাজেহান, অশোক ও প্রসেনজিৎ প্রভৃতি ঐতিহাসিক নায়কগণ ভারতবাসী হইয়াও কিরূপ অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিপিন বাবু একটু চেষ্টা করিলেই জানিতে পারিতেন। অতীতে যাহা ঘটিয়াছে, বর্ত্তমানেও তাহা অহরহ ঘটিতেছে। কে কাহার সন্ধান লয়? আমরা নিজ নিজ গৃহের অশান্তি-সাগরে ডুবিয়াও ইয়োরোপের তুলনায় সুখে আছি ভাবিয়া, কৃত্রিম চিত্তপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিতেছি। বর্ণ-শিক্ষাতে আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক সুখের তিলমাত্রও ক্ষতি হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

১৫। গরীব পরিবারে সর্ব্বত্রই ছেলে মেয়েরা সাংসারিক কার্য্যের সাহায্য করে না, অনেক স্থলে করে। পাঠশালায় পড়িলেও করে। বলপূর্ব্বক লেখা পড়া প্রচলিত করিতে গেলে পিতামাতার স্নেহমমতা কমিয়া যাইবে এবং পুত্র কন্যাগণের ভক্তি শ্রদ্ধাও শুষ্ক হইয়া যাইবে, আশঙ্কা করিয়া কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহার উত্তরে আমরা বলি, দরিদ্র পরিবারে অর্থাভাবে ও অনটন বশতঃ যে অশান্তি বিরাজ করিতেছে, পিতামাতা ও পুত্র কন্যাগণের মধ্যে যে ব্যবহারের কটুত্ব রহিয়াছে, লেখাপড়াশিক্ষা ও সদুপদেশ দ্বারা আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত হইলে, তাহা অনেকটা তিরোহিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

১৬। বৈদিক যুগে সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের স্মৃতি সে কলহের চিহ্ন ধরিয়া রাখিয়াছে। পরশুরাম ধরা নিঃক্ষত্রিয় করিতে যাইয়া ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়দ্বন্দ্ব সীমায় পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। কুমারিল ভট্ট হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধের মহাযজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন। তখন কি ইংরাজী শিক্ষা ও বিলাতী সভ্যতা এই সকল প্রতিযোগিতার জন্য দায়ী হইয়া-

ছিল? এখনো শিক্ষা না পাইয়াও বর্ণজ্ঞান শূন্য হইয়াও লোকে স্ব স্ব প্রধান হইতেছে। ইহার কারণ শিক্ষা নহে— ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। জোর জবরদস্তি করিয়া মানুষকে অজ্ঞানতায় আবদ্ধ রাখিয়া ব্রাহ্মণত্বের, জমীদারের এবং সমাজনিগ্রহের অধীন করিয়া দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা অপেক্ষা, সকলকে শিক্ষা, স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদান করিয়া প্রতিযোগিতার অসুবিধা ভোগ করা সহস্র গুণে শ্রেয়।

১৭। "আমাদের বর্ত্তমান অশিক্ষাই কি অশেষগুণে ভাল নয়?" একথা বলিবার শিক্ষিত বিপিন বাবুর অধিকার আছে কি? তিনি কি অজ্ঞানবর্জ্জিত 'অজমূর্খ' থাকিতেন, আমরা তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিতাম—বুঝিতাম তিনি অভ্রান্ত না হইলেও sincere.

যিনি স্বাধীনতার বিরোধী, পরাধীনতার বিরোধী, উন্নতির বিরোধী, অবনতির বিরোধী, সভ্যতার বিরোধী, শিক্ষার বিরোধী, তাঁহার মত সমালোচনা করা বৃথা। তবে কুটিল জটিল যুক্তিজালের ভেল্কী ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রত্যেক বঙ্গবাসীর কর্ত্তব্য। এই সকল স্বদেশসেবীর প্রেম-পীড়নে কাতর হইয়া দীনা বঙ্গ জননী আর্ত্তনাদ করিতেছেন—

"Oh, Save me from my friends."

শ্রীরসিক লাল রায়।

উভয় রামকৃষ্ণের তুলনা।

(বাহ্য-জীবন বিষয়ক)

বিগত চৈত্রের নব্যভারতে বিশ্বমঙ্গলের আখড়া শীর্ষক প্রবন্ধে গোঁসাই রামকৃষ্ণের বাহ্য-জীবনসম্বন্ধেই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছি, তাঁহার ধর্ম্মমত ও ভজন-প্রণালী সম্বন্ধে কোন বিবরণ প্রদান করি নাই। উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে তুলনার জন্য দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ মাত্র করিয়াছিলাম। উভয়ের তুলনা করিতে হইলে উভয়েরই বাহ্য বিবরণ কিছু জানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

পরমহংস রামকৃষ্ণের কতিপয় শিষ্য তাঁহার বাহ্য ও অন্তর্জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তাঁহারা পরমহংসের ভজন ও উপদেশাদি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার উপরেই অনেকাংশে আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার বাহ্য-জীবনের অবস্থা যাহা দক্ষিণেশ্বর ও দক্ষিণেশ্বরের স্থাপয়িত্রীসহ বিজড়িত, যাহা স্বাধীন প্রমাণান্তরবেদ্য, সেই অংশে তাঁহাদের বর্ণনার উপর ষোল আনা নির্ভর করিতে পারিব না;— এই অংশে তাঁহাদের লেখা অপূর্ণ, অস্পষ্ট, মলিন ও সঙ্গদমতা-বিহীন। অথচ, এই অংশের মধ্যেই পরমহংস রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম-জীবনগত জন্ম, শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও অবসান নিহিত রহিয়াছে। মন্বাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাই, প্রাকৃত জনকজননী হইতেও ধর্ম্মজীবনের পালক পালিকাগণের ঋণ অধিকতর গুরুভারাক্রান্ত। ধর্ম্মজীবনের সহায় ও আশ্রয়দাতৃগণের জীবনসহ ধার্ম্মিকের জীবন অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত থাকে। সেই শৃঙ্খল সৌন্দর্য্য ও মহিমা হৃদয়ঙ্গম না হইলে, ধার্ম্মিক-জীবন বুঝিয়া উঠা যায় না। এমন কি, ধর্ম্ম-জীবনের শত্রুগণ পর্য্যন্ত আলোক-

প্রদ হয়, এবং ধার্ম্মিকের সঙ্গে সঙ্গে অমরতা লাভ করিয়া থাকে। পরমহংসের জীবন হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এই অংশ উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যিনি তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন লিখিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাকে এই অংশের প্রতি সমুচিত সহৃদয়তা প্রকাশ করিতে হইবে। আমরা তাঁহার জীবনী লিখিতে বসি নাই, তাঁহার জীবন সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কয়েকটী কথা বলিতে প্রস্তুত হইয়াছি; সে অবস্থায়ও দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরসহ তদীয় জীবন-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছি না। অথচ, পরমহংসের ভক্ত সম্প্রদায় যেন দক্ষিণেশ্বরের সম্পর্ক না করিয়াও তাঁহার জীবন ধারণা করিতে সমর্থ বলিয়া মনে হয়। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাঁহাদের লেখা এই অংশে অস্পষ্ট, অপূর্ণ ও মলিন। কাজেই, এই অংশের জন্য আমাদিগকে স্বাধীন প্রমাণ অন্বেষণ করিতে হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ, পরমহংসের অন্ততঃ বাহ্যজীবন জানিবার পক্ষে আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুবিধাই ঘটিয়াছিল।

অনেকেই কলিকাতার প্রভাবশালী ধনকুবের জমীদার ৺ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের কথা অবগত আছেন। দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের স্থাপয়িত্রী রাণী রাসমণির পরে ইনিই আজীবন দক্ষিণেশ্বরের সেবাইতের কার্য্য চালাইয়া গিয়াছেন। তিনি রাণী রাসমণির একতম দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন। পরমহংস-ঘটিত বহু কার্য্যই তাঁহার চক্ষের উপরে, তাঁহার কর্ত্তৃত্বের অধীন ও রক্ষণাবেক্ষণে ঘটিয়াছে, তিনি পিতা ও মাতামহীর সহিত পরমহংস সম্বন্ধীয় বহু ঘটনাতেই স্বয়ং জড়িত ছিলেন; অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং যাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহাও তাঁহার জানিবার বিশেষ সুবিধা ও অধিকার ছিল। বলিতে কি, পরমহংস-গত কোন কথাই তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। ৺ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস মহাশয় নিজের কোন বিশেষ প্রয়োজনে, ১৩০৭ সনের ২৫শে অগ্রহায়ণের পত্রদ্বারা আমাকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, ঐ সনের শীত ঋতুতে আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। উপস্থিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া, তিনি আমাকে মাতামহী ৺রাণী রাসমণির এক খানা প্রামাণিক জীবনচরিত লিখিতে অনুরোধ করেন। আমি আনন্দের সহিত সম্মত হই। তাহার পরেই তিনি তাঁহার কৃত উইল ও অন্যান্য কাগজ পত্র দেখান ও অনেক কথা নোট করিয়া দেন। কথা হয়, তিনি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ আমার নিকট জীবনচরিতের উপকরণগুলি পাঠাইয়া দিবেন, আমি অবসর মত লিপিবদ্ধ করিব। ইহার পর, ঐ সময়েই তিনি অতীব প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক দক্ষিণেশ্বর দর্শন জন্য আহ্বান করেন, এবং পরদিবস আমরা বাসায় প্রাতে স্নানাদি সম্পাদন পূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়া এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণেশ্বর দর্শনে যাই। সেই স্থানে যাইবার পর তিনি দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধে সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন, লিখাইয়া দেন, পূজারীগণকে সমক্ষে উপস্থিত করিয়া আমূল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে বলেন। তাঁহারা যাহা যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি সমগ্র কথা নোট করিয়া লইলাম। ইহার পরেও তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও অনেক পত্র বিনিময় হইয়াছে। তিনি ১৩০৮ সনের ২৬শে মাঘের পত্রে লিখেন—"৺রাণী রাসমণি মাতামহী ঠাকুরাণীর জীবন-চরিত সম্বন্ধে ইন্‌ফরমেশন সংগ্রহ করা হইয়াছে, তবে আমার

শরীর গতিক বড় ভাল নহে, সময় অভাব বশতঃ পাঠাইতে পারি নাই। তবে পাঠাইবার চেষ্টায় আছি।" (৩পৃং) দুর্ভাগ্যবশতঃ, তিনি সংগৃহীত বিবরণের ষোল আনা প্রেরণ করিবার পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন। সমগ্র বিবরণ দান করিতে পারেন নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন, দেখাইয়াছেন, ও দিয়াছেন, তাহা একটা সমগ্র জীবনের পর্য্যাপ্ত উপকরণ না হইলেও, দক্ষিণেশ্বর ও রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে অপ্রচুর নহে। এই বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া রামকৃষ্ণ ও দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধে দুচারটী কথা বলিব মাত্র। বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য, ৺ত্রৈলোক্যবাবুর দক্ষিণেশ্বরের বিবরণ সংগ্রহের পূর্ব্বে, ১৮৯২ খ্রী, অর্থাৎ ঐ ঘটনার প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে, আমি দক্ষিণেশ্বর বিশেষ ভাবে দেখিয়া লই এবং ঢাকা গেজেটের তদানীন্তন সম্পাদক মদীয় বন্ধু ৺শশিভূষণ দত্ত রায় মহাশয়ের অনুরোধে ঢাকা গেজেটে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের বর্ণনা প্রকাশ করি।

৺ত্রৈলোক্যবাবু কিরূপ একজন মহান্ আচার-নিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, নিম্নবর্ত্তী একটী প্রশ্নেই পাঠক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি আমাদের অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন —"ভাল, আমরা ত জানি আপনাদের ঢাকা প্রভৃতি বাঙ্গালা দেশের লোক, ইংরাজী শিখিয়াই পিতা মাতার শ্রাদ্ধ ছাড়িয়া দেয়, কলিকাতা আসিয়া গাড়ীতে স্ত্রী লইয়া বেড়ায় ও ব্রহ্ম উপাসনা করে, তবে আপনার হিন্দু-শাস্ত্রে এত জ্ঞান হইল কিরূপে?" এই প্রশ্ন যেন এই যুগের হিন্দুর কথা নহে।

কলিকাতায় যে ৫।৭ ঘর অতি বড় বড় পরিবার আছেন, রাণী রাসমণির ধনকুবের বংশধরগণ তাঁহাদের অন্যতম। তন্মধ্যে ত্রৈলোক্যবাবু নেতৃ স্থানীয় ছিলেন। একে ত এত ধন, এত জন, তাহার উপর আবার তিনি একজন অতি বড় কর্ম্মী, আনুষ্ঠানিক, সামাজিক হিন্দু এবং রাণী রাসমণির স্থাপিত বিবিধ স্থানের দেবমন্দির ও অন্নসত্রাদির কঠোর কর্ম্মনিষ্ঠ সেবাইৎ ছিলেন। তাঁহার চক্ষে কর্ম্ম-শৈথিল্য অমার্জ্জনীয় অপরাধ ছিল। তাঁহার চক্ষে জ্ঞানী কি ভক্ত, হিন্দুর আচার নিষ্ঠা-যুক্ত না হইলে সমাদর-যোগ্য বলিয়া গণ্য হইতেন না। নিম্নে এই ভাবের দুইটী কথা উল্লেখ করিতেছি।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের সমাধির পরে, দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানেই প্রতি বৎসর ফাল্গুনে রামকৃষ্ণোৎসব চলিতেছিল। ১৩০৩ সালের উৎসবে, স্বামী বিবেকানন্দ কতিপয় ইংরাজ ও মুসলমানভক্ত সহ কালীর উদ্যানে উৎসবে যোগদান করেন। ইহা জানিতে পারিয়া, ত্রৈলোক্যবাবু ১৩০৪ সনে চিরতরে দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে রামকৃষ্ণোৎসব বন্ধ করিয়া দেন। ইহার পর আর উদ্যানে রামকৃষ্ণোৎসব হইতে পারে নাই।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই বঙ্গবাসীর সুযোগ্য সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—"স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ প্রভৃতি পর্য্যটনান্তে কালীদর্শনার্থে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গমন করিয়াছেন বলিয়া মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস মহাশয় কালীর আঙ্গিনা গঙ্গাজল দ্বারা ধৌত করাইয়া আবার সমস্ত দেবতার অভিষেক করাইয়াছেন। বিশ্বাস মহাশয় সামাজিকের উপযুক্ত আচরণই করিয়াছেন।" তদানীন্তন বঙ্গমতীতে ইহার একটু প্রতিবাদ হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুতই ত্রৈলোক্যবাবু ঐ সকল কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই

আচার-শিথিল মুখসর্ব্বস্ব সমাজে এই আকারের কঠোর কর্ম্মনিষ্ঠ কয়জন মহাত্মা বিদ্যমান আছেন। (১) ত্রৈলোক্যবাবু কেবল মাতামহী ও মাতার প্রতিষ্ঠিত মন্দির সমূহের সেবাইৎ ছিলেন না, নিজেও বহুব্যয়ে কাশীতে শিবমন্দির স্থাপন ও ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুর আচার বক্ষায় পাষাণবৎ কঠিন হইলেও ত্রৈলোক্যবাবু পাষণ্ডের ন্যায় লোক ছিলেন না, তাঁহার হৃদয় বড়ই কোমল ছিল। তিনি ১৩০৭ সালের শীত ঋতুতে, দক্ষিণেশ্বর যাইয়া গঙ্গাতটবর্ত্তী সেই নির্জ্জন বটবৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়া পরমহংস সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার পরেই, প্রসঙ্গক্রমে, তদীয় মাতামহ ৺রাজচন্দ্র দাস সম্বন্ধে কথা উঠাইলেন। তিনি ঐ প্রসঙ্গে যেমন রাজচন্দ্র দাস মহাশয় ও তদীয় আপ্তবন্ধু মহাত্মা জন বেব্ সাহেবের কথা আরম্ভ করিলেন, অমনি তাঁহার বিশাল নেত্রদ্বয় হইতে দর দর ধারায় অশ্রু প্রবাহ বহিতে হইতে লাগিল। তিনি যতই সেই উদারহৃদয় মহাত্মা ব্যক্তিদ্বয়ের সৌহার্দ্দ, প্রীতির মধুময়ী কথাগুলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই প্রবলবেগে সে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তিনি ভাববিহ্বল অবস্থায়, বলিবামাত্র, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগোপালবাবু আমার হস্তে একটী সোণার ঘড়ী প্রদান করিলেন। আমি সসম্ভ্রমে ঘড়িটী হস্তে লইয়া সুন্দররূপে উহা দেখিয়া লইলাম, এবং তৎক্ষণাৎ খোদিত বর্ণাবলী নোট করিয়া লইলাম। তাহা এই :—

"A token of esteem
sent by
John Bebb Esq, of London
to his friend
BABU RAJ CHANDRA DASS
January, 1826"

জন বেব লণ্ডন মহানগরীস্থ তদানীন্তন ধনকুবের ও অভিজাতবর্গের একজন অগ্রণী ছিলেন। যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, জন বেব সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন প্রধান অতিজাত অংশীদার ছিলেন। তিনি অতীব কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, বাণিজ্যের অছিলায়, প্রায় ছদ্মবেশে অনাড়ম্বরে কোম্পানীর নববিজিত ভারতবর্ষ দেখিবার জন্য আগমন করেন। তিনি ব্যতীত মহামান্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন অভিজাত মালিক নাকি আর ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। তিনি কলিকাতা আসিয়াই রাজচন্দ্র দাস মহাশয়ের উদারভাব দর্শনে অতীব প্রীত হইয়া, তাঁহার সঙ্গে আজীবন বন্ধুতা-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া পড়েন। মহাত্মা জন বেব তাঁহাকে অপার সম্পদে ও গৌরবে (২) উদ্গীত করেন। সে

(১) অনেকে বলেন, পরমহংসের কোন কোন জীবন-চরিতে রাণী রাসমণির জাতি উপলক্ষে যে একটী ইঙ্গিত দেখা যায়, তাহা ত্রৈলোক্যবাবুর এই কঠোরতার ফল। তাঁহারা বলেন, রাণী রাসমণি চাষীকৈবর্ত্ত (মাহিষ্য) সম্প্রদায়ের লোক। সমাজে এই জাতির প্রচুর মর্য্যাদা। তদবস্থায় এইরূপ ইঙ্গিত করা স্বাভাবিক নহে। আমরা বলি, বাঙ্গালীদিগের পরস্পর জাতি নিন্দা করা প্রকৃতিগত দোষ। উহার কোন হেতু থাকা আবশ্যক করে না। বৈদ্য ও কায়স্থ জাতি বিষয়ক পুস্তকগুলি দেখিলেই বুঝা যায়—শিক্ষার জ্ঞানে এই দোষ দূর করে না। কাজেই ত্রৈলোক্যবাবুর কঠোরতা উক্ত নিন্দার কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না।

(২) তদীয় বংশধর পঞ্চাশজন অশ্বারোহী-বেষ্টিত হইয়া চতুর্দ্দোলযানে ভ্রমণ করা প্রভৃতি সম্মান প্রাপ্তির অধিকার সনদ ত্রৈলোক্য বাবুর হস্তে নিহিত ছিল।

চিত্তহারিণী কথা গুলি বলিবার স্থান পাই। মহাত্মা জন বেথুন ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াও বন্ধুর কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; তাই ১৮২৬ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে ঐ স্বর্ণ ঘড়িটী বাবু জয়চন্দ্র দাস মহাশয়কে অপার স্নেহের চিহ্নস্বরূপ পাঠাইয়া দেন। ত্রৈলোক্য বাবু তাঁহার উদার হৃদয় মাতামহ এবং মহাত্মা জন বেথুন সাহেবের কথা বলিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলেন। একজন আচার-কর্কশ কঠোরকর্ম্মী ব্যক্তি জন বেথুনের কাহিনী স্মরণ করিয়া কি বিহ্বলভাবে বশবর্ত্তীই না হইয়াছিলেন।

রাণী রাসমণি, স্বামী রাজচন্দ্র দাস (বার বাহাদুর) মহাশয়ের মৃত্যুর পর অপার সম্পদের অধিকারিণী হইয়া কুবেরের ভাণ্ডার খুলিয়া বিবিধ বিচিত্র পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাণী রাসমণি সাধারণ ভাবের লেখা পড়া জানিতেন। তিনি নিজ উইল-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন—"রাসমণী দাসী" কিন্তু এই পুণ্যশীলা নারীর প্রতিভা অসাধারণ ছিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিয়া যে প্রণালীতে যে সকল বৃহদনুষ্ঠান নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন, তেমন বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তিও সে সকল কার্য্য ও প্রণালী সৌষ্ঠব সহসা ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন না। তাঁহার সমগ্র পুণ্যকার্য্যের বিবরণ চিন্তা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আমরা অদ্য কেবল দক্ষিণেশ্বরের বিরাট ব্যাপার সম্বন্ধে ও তৎসংসৃষ্ট পরমহংস রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলিব।

রাণী রাসমণি কালী মন্দির নির্ম্মাণ করেন, ১২৪২ সনে, দক্ষিণেশ্বর গ্রামস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী পঞ্চান্ন বিঘা ভূমি সমেত হেষ্টিংশ সাহেবের কুঠী খরিদ করেন। ৫৫০০০৲ পঞ্চান্ন হাজার টাকা মূল্যে মায় কুঠী এই ভূমি খরিদ হয়। ইহার দক্ষিণে গবর্ণমেণ্ট মেগেজিন, উত্তরে যদুনাথ মল্লিকের বাগিচা, পূর্ব্বে বসতি ও পশ্চিমে গঙ্গা। খরিদের সন হইতে মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ গঙ্গার ধারে পোস্তা ও ঘাট বান্ধিয়া উঠান হয়। বহু ক্লেশে এই কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে পশ্চিম দক্ষিণ কোণস্থিত ঘুঘুডির টেক হইতে সমাগত প্রবল বাণের আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহাতে রাণী রাসমণি অসন্তুষ্ট হইয়া মেকিণ্টোশ কোম্পানীকে একলক্ষ বাইট হাজার টাকার চুক্তিতে পোস্তা ও ঘাট বান্ধিবার কণ্ট্রাক্ট প্রদান করেন। মেকিণ্টশ কোম্পানী, ভাঙ্গা পোস্তা ও ঘাটের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিয়া, অনেক নিম্ন হইতে পোস্তা ও ঘাট বাঁধিয়া, অতীব দক্ষতা ও কৌশল সহ কার্য্য সমাপ্ত করেন। ইহাতে রাণী রাসমণি চুক্তির টাকার উপরেও কোম্পানীকে অনেক টাকা বক্সিস্ দান করেন। সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শ অনুসারে মন্দিরের কার্য্য হইতে থাকে। মন্দিরের কার্য্য ১২৪২ সালে আরম্ভ হইয়া, ১২৬০ সালে সমাপ্ত হয়।। মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে কিঞ্চিদধিক ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। ১২৬১ সনের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রা দিবস মহাসমারোহে মন্দির-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রতিষ্ঠায় কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। কালীবাড়ীর সেবা নির্ব্বাহের জন্য রাণী রাসমণি যে জমিদারী দেবোত্তর দান করিয়া গিয়াছেন,

ভারতবর্ষের হুজুগে বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই ৺রাজচন্দ্র দাস মহাশয়ের উদ্যানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন বলিয়া প্রকাশ। কলিকাতায় রাজচন্দ্র দাসের ঘাট প্রভৃতি অনেক অনুষ্ঠান এখনও আছে।

তাহা দিনাজপুর জেলার ৭৩।৭৪ নং তৌজী ভুক্ত। উহার সুদর জমা বার্ষিক চব্বিশ হাজার টাকা। বার্ষিক স্থিত প্রায় ষাইট হাজার টাকা (৩)। রাণী রাসমণির জীবন কালে এই জমিদারীর আয়ে কালীবাড়ীর বিরাট দেবসেবা ও অতিথিসেবার সামান্য অংশই নির্ব্বাহ হইত।। এখনও এই জমিদারীর আয় দ্বারা কালীবাড়ীর পূজা, উৎসব ও আতিথ্য ব্যয় সঙ্কুলান হয় না, আরও টাকা দিতে হয়। রাণী রাসমণির জীবন কালের মহামহোৎসবে, অন্নদান যজ্ঞে, প্রতিবৎসর বহুতর টাকা অন্য তহবিল হইতে প্রদান করিতে হইত। তাঁহার সময়ে মন্দিরের সন্নিহিত স্থানে, দক্ষিণেশ্বরে মাসিক ৫০৲ টাকার ন্যূন বেতনভোগী যে কোন আফিসের কর্ম্মচারী প্রতিদিন কালীর প্রসাদ পাইতেন, বাসাখরচ করিতে হইত না। ইহা একটা নিয়ম মাত্র—মূলে নিকটস্থ বাসাধারী সকলেই কালীর প্রসাদ পাইতেন। এইরূপ বিরাট ব্যয় পশ্চিমের রাজরাজরা ছাড়া অন্যের পক্ষে নির্ব্বাহ করা কত কঠিন, তাহা চিন্তনীয়। স্বর্গীয়া রাণী রাসমণি অম্লান চিত্তে, খোলা হৃদয়ে, এই ব্যয় অকাতরে বহন করিয়াছেন। মন্দিরের ভূমিক্রয়, পোস্তা, ঘাট, মন্দির নির্ম্মাণ, মন্দির প্রতিষ্ঠা, দেবোত্তর জমিদারী দান, সেবা, উৎসব ও আতিথ্যের বাবদ এক দক্ষিণেশ্বরের কল্যাণেই রাণী রাসমণি প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন॥ ইহা ছাড়া অন্যান্য দেবতা প্রতিষ্ঠা ও বিবিধ তীর্থে অন্নসত্রাদির কথা ত বলাই বাহুল্য। রাণী রাসমণি এই অপার অর্থব্যয় করিয়াও স্বকীয় জমিদারী প্রভৃতি সম্পত্তির বিন্দুমাত্র ক্ষতি করিয়া যান নাই। সে গুলি তাঁহার বংশধরগণের হস্তে ক্রমশঃই বিস্তারলাভ করিতেছে।

(৩) এই জমিদারীর মূল্য চিন্তা করুন।

গঙ্গার পশ্চিম তীর হইতে পূর্ব্ব তটবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতি দৃষ্টি করিলে দ্বাদশ-শিব-মন্দির সহ সমস্তগুলি মন্দির একটী মন্দির বলিয়া প্রতীতি হয়। সে দিব্য দৃশ্য দর্শন করিলে মনে হয়, যেন দেবরাজ শতক্রতু শতযূপ-চিহ্নিত, শতচূড়-নির্ম্মিত, শত পতাকা-সমাকুল স্বকীয় বিমান, রাণী রাসমণির মন্দির ছলে, ভাগীরথী তটে রাণিয়া অবগাহনার্থে গঙ্গাবারিতে নিমগ্ন হইয়াছেন। বস্তুতঃ, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির গৌড়দেশীয় ধর্ম্মানুরাগের বিজয় পতাকা।

এই মন্দিরের বিশাল আঙ্গিনা দৈর্ঘ্যে ৪৪০ ফিট্ এবং প্রস্থে ২২০ ফিট। এই আঙ্গিনা উত্তর দক্ষিণে গঙ্গাতটানুসারে বিস্তৃত। আঙ্গিনার পশ্চিম প্রান্তে উত্তর দক্ষিণে শ্রেণীবদ্ধ দ্বাদশ শিবমন্দির। মধ্যবর্ত্তী মন্দিরদ্বয়ের একটু বাহিরে সিংহদ্বার ও নহবৎখানা। তাহার লগ্ন পশ্চিমেই পাকা সড়ক, তাহার পশ্চিমেই পোস্তা হইতে বিশাল সোপানপংক্তি গঙ্গাগহ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত--যাহা মেকিন্টশ কোম্পানী বান্ধিয়া ছিলেন। আঙ্গিনার উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব প্রান্তে একতালা দালান-পংক্তিত্রয়; তাহাদের প্রত্যেকটীর মধ্যস্থল দিয়া বাহির হইবার জন্য বড় বড় তোরণ-দ্বার। আঙ্গিনার পূর্ব্বপ্রান্ত ব্যাপিয়া বিষ্ণু-মন্দির, কালী-মন্দির ও নাট-মন্দির দক্ষিণাভিমুখে সংসক্তভাবে বিস্তৃত। মন্দিরদ্বয় ও নাট-মন্দিরের পশ্চিমেই আঙ্গিনার বিশালভাগ, যাহার পশ্চিম প্রান্তে উল্লিখিত দ্বাদশ শিব-মন্দির। কালী-মন্দিরের অভ্যন্তরে বেদীর উপরে ঘন রৌপ্য-নির্ম্মিত যথাক্রমে ছোট বড় দলে গঠিত রৌপ্য শতদল। উহার পরিধি প্রায় তিন হাত। এই বিশাল ঘন দৃঢ় রৌপ্যময় দল গঠিত শতদলের উপর শব। তাঁহার উপরে স্থিতা

আট নয় বর্ষবয়স্কা একটী পাষাণময়ী বালিকা মূর্ত্তিই দক্ষিণেশ্বরের প্রসিদ্ধ ৺কালী। সে মূর্ত্তি অতীব আনন্দময়ী, দেখিলেই বাৎসল্য ভক্তির সঞ্চার হয়। রাণী রাসমণি যেমন অপার ঐশ্বর্য্যশালিনী রাণী, এ কন্যাও তেমনই সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা রাজকন্যা। শিরঃ, কর্ণ, কণ্ঠ, বক্ষঃ, কটি,পাদপদ্ম কাঞ্চন-বস্ত্রাদিতে পরিব্যাপ্ত ও খচিত। পার্শ্বেই রৌপ্যময় খাট ও শয়নের বিবিধ সমুজ্জ্বল উপকরণ, রূপার বাটা, রূপার কলস, কাড়ি, স্থালী, গ্লাস, চামর প্রভৃতি যথানিয়মে সজ্জিত। দেখিলেই মনে হয়, যেন রাজভবনে গর্ব্বিতা আনন্দময়ী দিব্য বালিকা। ইঁহার পূজার জন্যই রাণী রাসমণি অপার ধন জলস্রোতের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে ঢালিয়া দিয়াছেন। সে অর্থের দ্বারা একজন লোক মহারাজ উপাধি গ্রহণ, ধারণ ও পোষণ করিতে অবলীলাক্রমে সমর্থ হয়। ইঁহার সেবার্থে দক্ষিণেশ্বরে প্রায় ৭০।৭৫ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত। ইঁহার সেবার্থেই একটী ব্রাহ্মণ পরিবার নিযুক্ত।

এই ব্রাহ্মণ পরিবারের নিবাস জেলা হুগলীর অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রাম। ইঁহারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, কুলীন, খড়দহ মেল, গোপালের সন্তান, স্বভাব। ইঁহারা চট্টোপাধ্যায়।

৺কালীর পূজা নির্ব্বাহের জন্য রাণী রাসমণি খুদীরাম চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার ভট্টাচার্য্যকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ কালীর পূজারীগিরি করিয়া আসিতেছেন। খুদীরাম চট্টোপাধ্যায়ের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ রামকুমার, মধ্যম রামেশ্বর, কনিষ্ঠ গদাধর। রামেশ্বরের পুত্র রামলাল।

রামকুমার ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর, গদাধর তৎপদে নিযুক্ত হইয়া পূজারীর কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করেন। এই গদাধরই ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস। ত্রৈলোক্য বাবুর পিতা মথুর বাবু, রাণী রাসমণির সংসারের কর্ত্তা ছিলেন—রাণী রাসমণির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনি নিজে যেমনি তেজস্বী, প্রভাবশালী, তেমনি একজন সাধক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার কৃপায় গদাধর পিতৃ কার্য্যে ব্রতী হন। এই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পূজারীর কার্য্য অতীব শ্রমসাধ্য ব্যাপার।

দৈনন্দিন কার্য্য মধ্যে প্রতিদিন প্রাতে আরতি করিতে হয়, দশটার সময় নৈবেদ্য ভোগ, বারটার সময় অন্ন ব্যঞ্জন ভোগ, ছয়টার সময় ছানা সন্দেশাদি দ্বারা বৈকালিক ভোগ, রাত্রি আটটার সময় শীতলী ভোগ লাগাইতে হয়। ইহা ছাড়া, প্রতি অমাবস্যার পূজা, বিশেষতঃ কার্ত্তিক অমাবস্যা, সাবিত্রী চতুর্দ্দশী, স্নান-যাত্রা ও জন্মতিথির পূজা বিশেষ কার্য্য। ইহা ছাড়া, দুর্গোৎসব, বাসন্তী, রটন্তী, জগদ্ধাত্রী পূজা করিতে হয়। প্রয়োজন মতে, বিষ্ণু অর্চ্চনার উৎসব, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাস প্রভৃতিতে যোগ দিতে হয়। গদাধর পূজারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, প্রথমতঃ কালীবাড়ীর ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার প্রভৃতি মুনিবদিগকে তুষ্ট করিতে সমর্থ হন। সুন্দর রূপে কালী পূজা, বিষ্ণু পূজা ও শিব-পূজাদি চলিতে লাগিল। শেষে গদাধরের ত্রুটি বাহির হইতে লাগিল। পূজকের যেরূপ নিষ্ঠা নিয়ম থাকা আবশ্যক, তাহাতে তাঁহার ত্রুটি দৃষ্ট হইতে লাগিল, পূর্ব্ববৎ যথানিয়মে পূজাগুলি তিনি নির্ব্বাহ করিতে শৈথিল্য করিতে লাগিলেন। যে পূজার জন্য এত আয়োজন, সেই পূজায় বাধা পড়িতে লাগিল। ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারিগণ যার পর নাই ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, ও দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা গদাধরকে পূজারীর অযোগ্য স্থির করিলেন।

তাঁহাদের ইচ্ছা হইল, উঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পরিশেষে, তাঁহারা সমস্ত বিষয় মথুর বাবুর নিকট পেশ করিলেন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া,গদাধরকে কোন প্রকারের সাধক শ্রেণীর লোক বলিয়া সন্দেহ করিলেন, তাড়াইয়া দিলেন না, তাঁহার দ্বারা কার্য্য চালাইয়া লইতে বলিলেন। অন্যের সাহায্যে কার্য্য একরূপ চলিল। রামকৃষ্ণের ভক্তগণ বলেন, তিনি প্রেমবিহ্বলতাবশতঃ পূজাদি করিতে সমর্থ ছিলেন না। যাহা হউক, তাঁহার ব্যবহার সম্বন্ধে নানা অর্থই হইতে লাগিল। মথুর বাবু নিজে একজন সাধক লোক ছিলেন; রাণী রাসমণি বিশেষ চেতনা-সম্পন্না নারী ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া, তাঁহাকে সমাদর করিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারিগণ আর করিবেন কি? তাঁহাদের উভয়ের এইরূপ সমাদরের ভাব দেখিয়া গদাধরের বিপক্ষগণ নীরব হইলেন। গদাধর উত্তরোত্তর পূজাদিকার্য্যে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিকটে সাধুভাবাপন্ন লোক আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে, মথুর বাবু পূজার জন্য অন্য বন্দোবস্ত করিয়া,গদাধরকে জানবাজারের নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। সেই স্থানে তিনি কতক কাল বাস করিবার পর, মথুর বাবু তাঁহাকে লইয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। প্রায় অশীতি সহস্র মুদ্রা ব্যয়ান্তে তাঁহাকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও স্বাধীন-ভাবে চলিবার অধিকার দান করিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়া দিলেন।

এই সমগ্র কাল ব্যাপিয়া তাঁহাকে কোন কঠোর ভজন, তপস্যা, ব্রতাদি করিতে দেখা যায় নাই; ধ্যানকারী এবং উন্মত্তের ন্যায় আচরণশীল দেখা গিয়াছে। তাঁহার মুখে গভীর জ্ঞানগর্ভ কথা শুনা গিয়াছে ও তাঁহাকে বহিঃ-সংজ্ঞা-রহিত হইতে দেখা গিয়াছে। এই সম্বন্ধে কর্ম্মঠ মনুষ্যগণের ধারণা করা সহজ নহে। তবে, মথুর বাবু ও রাণী রাসমণি স্বয়ং কতক অনুভব করিয়া এবং লোকের কাছে শুনিয়া তাঁহাকে বড় সাধক বলিয়া ভক্তি করিতেন। তাঁহাদের আশা ছিল,রামকৃষ্ণের প্রভাবে দক্ষিণেশ্বর জাগ্রত হইয়া উঠিবে। তাঁহারা রামকৃষ্ণের সাধনায়, গুরু গম্ভীর কথায়, সমাধির ভাবে তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতে লাগিলেন। মাতা যেমন শিশুপুত্রের শৌচাশৌচ, দোষাদোষ দর্শন করেন না, তাঁহাদের দৃষ্টিও রামকৃষ্ণের প্রতি সেইরূপ হইল। তাঁহারা তাঁহার কার্য্যে, ত্রৈলোক্য বাবুর ন্যায় কঠোর কর্ম্মীর সমালোচনা-চক্ষে দৃষ্টি করিতেন না, করিলে গদাধরের পক্ষে দক্ষিণেশ্বরে সেইভাবে সাধনমার্গে চলা সহজ হইত কি না, বলিতে পারি না। এই সকল কথা চিন্তা করিলে মনে হয়, পরমহংস রামকৃষ্ণ নিজ সাধন ভজন জন্য, উন্নত জীবন-লাভের জন্য, রাণী রাসমণি ও মথুর বাবুর নিকট কত ঋণী! সে স্নেহ, সে কৃপা, সে শ্রদ্ধা ও মমতা, সে মহান্ উদারতা নিজ জনক-জননীর নিকটেও তিনি পাইতেন না। এই সকল কথা তাঁহার জীবন-চরিতে অতীব ম্লান, অতি অস্পষ্ট, যেন বিলুপ্তপ্রায় বলিয়া বোধ হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কঠোর কর্ম্মী ত্রৈলোক্য বাবু পরমহংসের কার্য্য সমালোচনার চক্ষে দেখিতেন—সঙ্গেও কদাচ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনে ত্রুটী করেন নাই। তিনি পরমহংসের ভক্তি জ্ঞান ও সমাধি প্রভৃতি গুণ দর্শন করিয়া অতীব ভক্তি করিতেন, কিন্তু অনুষ্ঠান অংশে তাঁহাকে বিশেষ

সমালোচ্য মনে করিতেন। তাঁহার চক্ষে "যাহাকে রামকৃষ্ণ বলে, সে কোন কোন বিষয়ে খুবই ভাল ছিল।"

আমরা যতদূর দেখিতে পাই, কর্ম্মনিষ্ঠ আনুষ্ঠানিকগণ কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিকে ধারণা করিতে চাহেন না। তাঁহারা যে পাত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞানের যুগপৎ অনুষ্ঠান হইতেছে বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই পাত্রে ষোল আনা ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। জ্ঞানীদিগের মতে, কর্ম্ম ও জ্ঞানের যুগপৎ অনুষ্ঠান একেবারে অসম্ভব। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সমগ্র গীতা ভাষ্যে এই কর্ম্মসংকৃত জ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন (৪)। যাঁহাদের মতে কর্ম্ম-রহিত জ্ঞানে মুক্তি নাই, নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞান জীবের পক্ষে অসম্ভব, কর্ম্মসহকৃত জ্ঞানই মোক্ষের কারণ, তাঁহাদিগকে সমুচ্চয়বাদী বলে। জ্ঞানী শঙ্কর সমুচ্চয়বাদের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, কর্ম্ম ও জ্ঞান, অন্ধকার ও আলোকবৎ পরস্পর বিরুদ্ধ, যেমন অন্ধকার ও আলোক একত্র যুগপৎ অবস্থান করিতে পারে না, সেইরূপ, এক পাত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞান যুগপৎ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। অতএব সমুচ্চয়-বাদ ভ্রান্ত। শঙ্করাচার্য্য সমুচ্চয়বাদ এত দক্ষ-তার সহিত খণ্ডন করিয়া গেলেও, গৃহস্থ কর্ম্ম-ভক্ত জীবের হৃদয় হইতে সমুচ্চয়বাদ দূরীভূত হয় নাই। জ্ঞানী ও যোগিগণের ইহার পর আর এক ঘোর আচরণ আছে। তাঁহাদের অনেকে জড় উন্মত্ত ও পিশাচের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন। "যোগিনোঽপি জড়োন্মত্ত-পিশাচা ইব বর্ত্তন্তে। (স্বামী)। আনুষ্ঠানিক আচারনিষ্ঠ কর্ম্মী গৃহস্থের পক্ষে এ সকল আচরণ আবার সম্পূর্ণই অসহ্য। এই সম্বন্ধে তদানীন্তন ভারতবর্ষের প্রধানকর্ম্মী মণ্ডন মিশ্র ও প্রধান জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলে বিষয়টী স্পষ্ট হইবে।

এক দিবস মণ্ডন মিশ্র শ্রাদ্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে শঙ্করাচার্য্য আসিয়া তাঁহার নিকট বিচার-যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। একটা কর্ম্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্রাদ্ধস্থানে শব করায়, শ্রাদ্ধ নষ্ট হইয়া গেল মনে করিয়া মণ্ডন মিশ্র অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইয়া বলিলেন :—

"কস্থাং বহসি দুর্ব্বুদ্ধে গর্দ্দভেণাপি দুর্ব্বহাম।
শিখা যজ্ঞোপবীতাভ্যাং কন্থে ভাবো ভবিষ্যতি

ওহে দুর্ব্বুদ্ধি, তোমার শিখা ও যজ্ঞসূত্র কোথায়? একটা গাধাও যাহা বহন করিতে পারে না, সেইরূপ একটা কাঁথা গায় বহন করিতেছ, তোমার ন্যায় গাধার পক্ষে শিখা ও যজ্ঞোপবীত কি ভার হইতে পারে?

শিখা ও যজ্ঞোপবীতের সাহায্যে দ্বিজগণ কর্ম্মকাণ্ড নির্ব্বাহ করেন। সেই দুইটা ত্যাগ করিলে, কর্ম্ম করিবার উপায় থাকে না। শঙ্কর সন্ন্যাসী হইয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছেন। কাজেই তিনি মণ্ডনমতে কর্ম্মভ্রষ্ট এবং অশুচি। এইরূপ অন্যায় কার্য্যকারী বলিয়া মণ্ডনমিশ্র শঙ্করকে গর্দ্দভ ও দুর্ব্বুদ্ধি বলিলেন।

শঙ্করাচার্য্য বলিলেন :—

"কন্থাং বহামি দুর্ব্বুদ্ধে তব পিত্রাহমপি দুর্ব্বহাম।
শিখাযজ্ঞোপবীতাভ্যাং শ্রুতের্ভাবো ভবিষ্যতি॥

হে দুর্ব্বুদ্ধি মণ্ডন মিশ্র, তোমার পিতা (গাধা)ও যাহা বহন করিতে পারে না, সেরূপ কাঁথা আমি বহন করি, কিন্তু আমি শিখা ও যজ্ঞ

(৪) মৎকৃত গীতা-শঙ্কর-ভাষ্যের সমগ্র বঙ্গানুবাদে এগুলি বুঝাইয়াছি। উহা ঢাকা গেজেটের সম্পাদক ৺শশিভূষণ দত্ত মহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এখনও অমুদ্রিত।

সূত্র বহন করিলে বেদের উপর গুরুতর বোঝা চাপিয়া যায়।

"কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মা।" (আমরা আত্মদর্শী, আমরা পুত্র ও ধনাদি দ্বারা কি করিব, স্বর্গাদি-লোক আত্মা ভিন্ন কিছু নহে) ইত্যাদি বেদ-বচনে কর্ম্মসন্ন্যাস বিহিত আছে। আমি সন্ন্যাসী হইয়া শিখা ও যজ্ঞসূত্র ধারণ করিলে, কর্ম্মত্যাগ-বিষয়ক দেব বাক্যে আঘাত লাগে। শঙ্কর মতে মণ্ডন দুর্ব্বুদ্ধি, কেন না তিনি মহাহ্রদ স্থানীয় আত্ম-জ্ঞান-প্রতিষ্ঠ সন্ন্যাস না করিয়া ক্ষুদ্র কর্ম্ম কূপ সেবার জন্য কর্ম্মী গৃহস্থ হইয়া রহিয়াছেন।

ভারতবর্ষের কঠোরকর্ম্মী গৃহস্থ ও কর্ম্ম-সন্ন্যাসী মধ্যে এই ভাব চিরদিন চলিয়া আসিয়াছে। তবে যাঁহাদের কোন বিষয়ে নিষ্ঠা নাই, তাঁহারা খুব উদার হইতে পারেন। আর কিছু উদার হইতে পারেন, জ্ঞানাভাস-সম্পন্ন ব্যক্তি। আভাসশীল হইতে দৃঢ় কর্ম্ম-নিষ্ঠ সাধু গৃহস্থকে হীন বলা যায় না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস কি ভাবে প্রথমতঃ পূজারীপদে বৃত হইয়া, কি আকারে অনুষ্ঠান করিয়া উন্নত জীবনের অবস্থায় পঁহুছিয়াছিলেন, তাহার আভাস প্রদান করিয়াছি। তাঁহার সাধন ভজন সম্বন্ধে অনেক কথা তদীয় শিষ্য-বর্গ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাধকের অন্তর্জীবন, ভজন, ধর্ম্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত-গুলি শিষ্যগণ বিশেষ অবগত থাকেন। প্রাচীনতম নিয়মানুসারে গুরু সম্যক্ কৃপা না করিলে, সম্যক্ সাধন-শক্তি অর্পণ না করিলে, শিষ্য গুরুর ভজন, সাধন ও মত ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন না, শিষ্য গুরুদত্ত সাধন-শক্তি লাভ করিলে, তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি, ক্রিয়া অসাধারণ হইয়া দাঁড়ায়, লোকে তাঁহাকে গুরু হইতে বিশেষ ভেদসম্পন্ন বলিয়া ধারণা করিতে পারে না। রামকৃষ্ণ পরম-হংসের শিষ্যবৃন্দ মধ্যে কেহ তাঁহার মত ও ধর্ম্মপ্রচারে তৎকর্ত্তৃক বৃত হইয়া ছিলেন কি না, তাহা আমরা অবগত নই। তবে তাঁহারা তদীয় মত প্রচার করেন দেখিতে পাই। আমাদের কথাটা ভাঙ্গিয়া বুঝাইতেছি। মহাপ্রভু "চৈতন্য গোসাই" অষ্টশক্তি সঞ্চার করিয়া রূপকে গোঁসাই করেন, সর্ব্বপ্রকার ভক্তি-সিদ্ধান্ত লিখিয়া জীবমধ্যে প্রচার করিবার জন্যও স্বয়ং মুখ্য ভজন আচরণ করিয়া শিক্ষাদানের জন্য তাঁহার প্রতি ভার অর্পণ করেন। তাঁহার ভক্তি-সিদ্ধান্ত ও আচরণ আদর্শ রাখিয়াই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সুমহান্ গৌড়ীয় সম্প্রদায় শাসন করিয়া আসিতেছেন। এই কার্য্যে তিনি আরও পাঁচ গোঁসাই এবং মহান্তবর্গ সহায়রূপে প্রাপ্ত হন। এই জন্য কবি কর্ণপূর লিখিয়াছেন—"ততান (৫) রূপে।" রূপের হস্তে মহাপ্রভু স্বকীয় ভজন ও সিদ্ধান্ত জীবমধ্যে বিস্তার করিয়াছিলেন। পরমহংস রামকৃষ্ণের কোন শিষ্য এই আদর্শে তদীয় মত প্রচার করিবার জন্য বৃত হইয়াছিলেন কিনা, অবগত নহি। রূপ গোঁসাই শ্রীমন্মহা-প্রভুর কৃপায় কি কঠোর বৈরাগ্যশালী, কি কঠোর সাধনশীল, কি কঠোর শাসন-প্রবর্ত্তক ছিলেন, তাহা জগতে অবিদিত নাই। পরমহংস প্রেমবিহ্বলতাবশতঃ কালীর অর্চ্চনা চালাইতে পারেন নাই বলিয়া তদীয় শিষ্যদের লেখায় দেখিতে পাই। এই বিষয়ে গোঁসাইর মত সম্বন্ধে নিম্নে একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি। রাধাবল্লভ গোস্বামী রূপ গোঁসাইর শিষ্য ছিলেন। এই গোস্বামী

(৫) ততান রূপ-গোস্বামিদ্বারেণ স্বভক্তিসম্প্রদায়ং বিস্তরয়ামাস,ইত্যর্থঃ।

গুরু গোঁসাইর কৃপায় ভজনে অতীব অগ্রসর হইয়া, গোঁসাইর আদেশে ভগবদর্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন এবং অতি পরিপাটীক্রমে প্রতিদিন শ্রীবিগ্রহের সেবা চালাইতে লাগিলেন। এক দিবস হরিবাসরে রাধাবল্লভ গোস্বামী মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অর্চ্চনা করিতেছেন, ইত্যবসরে বাহির হইতে মন্দিরের অভ্যন্তরে গুরুতর ব্যায়ামের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। গোঁসাইর আদেশে বলপূর্ব্বক কপাট উদ্ঘাটিত করিবার পর দেখা গেল, রাধাবল্লভ গোস্বামী মন্দির মধ্যে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন। লোক-সমাগমে গোস্বামীর চেতনা হইল। তখন স্বয়ং গোঁসাই 'রূপ' আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সেই-রূপ বিচিত্র নৃত্য ও তাঁহার মুখে তাম্বুল-রাগ থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শিষ্য গোস্বামী ভীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"প্রভো, অর্চ্চনাব্যাপারের মধ্যভাগে স্বয়ং প্যারীজী আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, রাধাবল্লভ, তোমার ভজনে আমি বড় প্রীত হইয়াছি, তুমি তাম্বুল প্রসাদ গ্রহণ কর। আমি বলিলাম, গোঁসাইর আদেশ ভিন্ন এখন এই প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারি না। প্যারীজী বলিলেন, তোমার ভয় নাই, প্রসাদ গ্রহণ কর। তৎপর সেই তাম্বুল প্রসাদ গ্রহণ করিয়াই উন্মত্ত হইলাম। আমি একজন অতি ক্ষুদ্র জীব, এই বিপুল আনন্দের বেগ সহ্য করিয়া উঠিতে পারি নাই; প্রভো, এই ক্ষুদ্র জীবের প্রতি প্রসন্ন হউন।" গোঁসাই বলিলেন,—"তুমি গোঁসাইর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছ, প্রেমানন্দবশতঃ কৃষ্ণসেবার ব্যাঘাত করিয়াছ। তুমি ঘোর অপরাধী; এই মুহূর্ত্তে এই স্থান পরিত্যাগ কর। তোমাকে আমি পরিত্যাগ করিলাম।" গোস্বামী গুরুর অকৃপা-দর্শনে প্রাণত্যাগের জন্য অনশন ব্রত অবলম্বন করিলেন। তাহাতে প্যারীজী দর্শন দিয়া বলিলেন—"বল্লভ, প্রাণত্যাগ করিও না, তুমি আশ্বস্ত হও।" আবার গোঁসাইকে বলিলেন, —"রূপ, এই দীন শিষ্যের প্রতি কৃপা কর।" গোঁসাই বলিলেন—"তুমি গোপকন্যা, শিষ্য-শাসনের নিয়ম জান না; মহাপ্রভু-প্রদত্ত এই শাসন অধিকারে আমার কর্ত্তব্য আমি জানি। তোমার দয়ার্দ্র কথায় আমার গুরুর কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইতে পারি না।" সেই জন্মে রাধাবল্লভ গোস্বামী আর গোঁসাইর কৃপা পাইলেন না। কঠোর বৈরাগাশীল, কঠোর ভজনশীল "অন্তর্ভক্তিরসের পূর্ণ সরসী" গোঁসাই রূপের শাসন-বিধি বজ্রপাত হইতেও কঠিন। ইহা ছাড়া সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব এই পাঁচ গোঁসাই এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যতম মহান্ শিষ্য লোকনাথ গোঁসাইর অনুশাসন, আচরণ ও কথা চিন্তা করিলে প্রেমভজন কিরূপ কঠোরতা ও মহাবৈরাগ্যশীলতায় আবৃত, তাহা বুঝা যায়। ইঁহারা সকলেই বৃত। বলিতে কি, ইঁহারা গৌড়ীয় মতে মহাপ্রভুর আচার্য্য-মূর্ত্তি। ইঁহাদের ব্যবহারের মানদণ্ডেই জীবজাতীয় গুরু-শিষ্য ব্যবহার বিচার করা হয়। আমরা উভয় রামকৃষ্ণের মতামতাদির তুলনা করিবার সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের আভাস প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব। এই প্রবন্ধে উভয় রামকৃষ্ণের বাহ্য-জীবন সম্বন্ধে তুলনায় কয়েকটী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

উভয় রামকৃষ্ণের বাহ্যজীবন সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই, গোঁসাই রামকৃষ্ণ একজন মধ্যবিত্ত ভূম্যধিকারীর সন্তান, পরমহংস একজন গরীবের সন্তান!

পরমহংস দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পূজারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পরেও কতককাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যৌবনাবস্থার অনেক অংশ ব্যাপিয়া, একজন কর্ম্মপর গৃহস্থ, কৃতদার ও জীবিকার্থী, গোঁসাই রামকৃষ্ণ শৈশবেই জাত-বৈরাগ্য, কৈশোরেই ধৃত কৌপীন গুরু-শুশ্রূষাশীল দাণ্ড-শিষ্য, যৌবনে গিরিগহ্বরবাসী অরণ্য-সেবী তীর্থ-পর্য্যটক; গোঁসাই রামকৃষ্ণ ৩৬ বৎসর বিবিধ গিরি, বন, গুহা, আশ্রম, তীর্থে সাধুসঙ্গ লিপ্সায় ও ভজনে ভ্রমণশীল, তাহার পরও পাঁচ ছয় বৎসর ফরিদাবাদ, মাছুলিয়া, বেউলা প্রভৃতির বনে অবস্থায়ী—দুই স্থানে বাথালগণ তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল। পরমহংস রামকৃষ্ণের জীবনে ইত্যাকার কোন তীর্থ-পর্য্যটন, কৃচ্ছ্র সাধনা ও বৈরাগ্য-কঠোরতা লক্ষিত হয় না, অথচ যেন অকস্মাৎ বিকাশিত জ্ঞান বা জাগ্রত বলিয়া প্রতীতি হয়। এই জন্য অনেকে তাঁহাকে ভগবৎ-কৃপাসিদ্ধ বলেন। তিনি একবার বৃন্দাবন পর্য্যন্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে মথুরবাবুর স্নেহভক্তিশীতল কোলে উঠিয়া,—উক্ত তীর্থ পর্য্যটনে মথুর বাবুকে পর্য্যাপ্ত দান ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে।

গোঁসাই রামকৃষ্ণ গিরিকন্দরসেবী বৈরাগ্য-বিক্রান্ত, অকুতোভয় যোগী ও জ্ঞানী, এই সংসারে তাঁহার সহায়তার প্রয়োজন নাই; পরমহংস রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানে অবরুদ্ধ, বহু ভক্তজন কর্ত্তৃক সেবিত, পালিত ও রক্ষিত। গোঁসাই রামকৃষ্ণ স্বাধীন বন-বিহঙ্গ; পরমহংস রামকৃষ্ণ রাণী রাসমণির উদ্যানে সমৃদ্ধি-রসাল-শাখা-লম্বিত পোষা শুক পাখী।

গোঁসাইর পাদুকা ও আসন মাধব চৌধুরীর পর্ণকুটীরকে রাজভবনে পরিণত করিয়া বিরাট হিন্দু-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়া, বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের অনাবিল ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিতে পূজিত হইতেছে; পরমহংস রামকৃষ্ণের শয্যাসন পাদুকা রাণী রাসমণির সেই প্রসাদ-মন্দিরের এক কোণে সুরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু দর্শন করিলে মনে একটা বিষাদের ছায়া পতিত হয়। মনে হয় যেন, উহা গভীর বনের লতা-গুল্মে পরিবৃত হইয়া লোকলোচনের অন্তরালে নিহিত, এ জগতে তাঁহার কেহই নাই। যাইয়া দেখুন, গোঁসাই রামকৃষ্ণের সম্প্রদায় হিন্দু-সমাজের অভ্যন্তরেই সজীব, সতেজ ও বহুকার্য্য-সাধনক্ষম,—পরমহংস রামকৃষ্ণের কোন সম্প্রদায় হিন্দু-সমাজের অভ্যন্তরে প্রভাবশীল দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বাহ্য তুলনায় অন্তর্জীবনগত মাহাত্ম্যে কোন ভেদ বুঝা যায় না, তবে বৈরাগ্যশীল, সাধক সিদ্ধের জীবন সাধারণতঃ জীবের পক্ষে প্রীতিপ্রদ ও চমৎকৃতিজনক হয়। আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে উভয়ের ধর্ম্মমতাদি তুলনা করিয়া বুঝিব।

শ্রীবসন্তকুমার রায়।

শিশু-সৌন্দর্য্যে।

পবিত্রতা-লব্ধ চারু অমৃত সাগর
রমণীর স্নিগ্ধ প্রেম, স্বভাব সুন্দর
প্রাণ প্লাবি, সুশীতল, প্রীতির আধার
মধুর বৈচিত্র্যখনি—সুরভি-সম্ভার।
হেন পারাবার, প্রেম করিবে মন্থন
অখণ্ড-অমৃত-কণা শিশুর বদন
রম মলি সুরভিত সুষমায় ভরা
এনেছে করিতে ফুল্ল আমাদের ধরা।
মেদ মাংস রক্ত ঘেরা—প্রাণের শিখরে
কি আনন্দে স্বর্গহর্ষ ছুটাছুটি করে,
বিধাতার করুণার আতপ্ত পরশ
মাখাইছে প্রতিক্ষণ বাৎসল্যের রস।
সে রস করিয়া পান লোলুপ নয়ন
বার বার হেরিতেছে শিশুর বদন।

হে শঙ্কর।
মৃত বিরক্তির স্তূপ বৈরাগ্য পশরা
রাজদোহী শিরে লয়ে দূরে যাও ত্বরা,
মমতা, প্রাণের প্রাণ ছিঁড়িতে যে চায়,
ধরমের বিনিময়ে, আত্মহত্যা পায়,
ধর্ম্ম নহে পুঞ্জীকৃত জ্ঞানের কঙ্কাল
কাঠিন্যে গঠিত তন্ত্র দুর্ব্বোধ জঞ্জাল।
মায়া—জননীর স্নেহ, সংসার বন্ধন,
উদ্‌ভ্রান্ত জ্ঞানের খড়্গে কর'না ছেদন,
হৃদয়ের ধৌত করে সত্যের জীবনে,
মায়ারে আসন দাও প্রাণের বিজনে।
মায়া সুধা, মায়া নহে তীক্ষ্ণ হলাহল
অকুণ্ঠিত মায়া করে হৃদয় নির্ম্মল।
যিনি রসরাজ যিনি রহস্য আধার
অপ্রকাশ রূপে দীপ্ত, দয়া পারাবার
অকরণে বরুণে যিনি প্রকাশিয়া মায়া
শান্তিরূপে প্রসারিত করিছেন কায়া।
এ মায়া তাঁহারি মায়া—পরিত্যাজ্য নহে,
ধর্ম্মশীল এই মায়া নিজ শিরে বহে।
হরিয়ে চম্পক প্রভা, সুধা-শুভ হাসি
কোথা হ'তে এলি তুই নয়ন উদাসী
একি কাব্য? পুঞ্জীভূত ভাব সমবায়
একি ভাব? প্রকাশিতে ভাষা না কুলায়।
কল চঞ্চলতা তোর, ললিত কাকলি,
কোথা হ'তে প্রতি পলে উঠিছে উথলি?
এ বিশ্ব, উদ্যানে আছে কত শত ফুল
কোন্ ফুল বল শিশু তোর সমতুল?
চাঁদে আছে দীপ্তি, থাক্ কুসুমে সুবাস
কোথা আছে হেন আত্ম বিচিত্র বিকাশ?
অনুভূতি হীন জড়, দেখাক্ সুষমা
শিশু শোভা তার সনে, কে দিবে উপমা?
প্রফুল্ল বদন খানি স্বর্গ চিহ্নে আঁকা,
লাবণ্য কিরণ দিয়া সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা।

হে অতিথি! হে পুলক! আনন্দক নব
কোথা হ'তে আনিলিরে এ দিব্য বিভব?
অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য তোর দুর্গন্ধি সুবাস
মণিস্নিগ্ধ শুভ্র হাসি করিছে প্রকাশ
মর্ত্ত্যে বিধি দেন নাই সে শক্তি বিধান
যে শক্তি এ মন্দারের ল'তে পারে ঘ্রাণ,
তবু যেন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা শত শত,
বিস্তারি প্রয়াস আছে, হইয়ে জাগ্রত।
পথভ্রান্ত সুরভির ক্ষণিকের ঘ্রাণ
হয়তো লভিয়ে তারা এরে বেপমান।
অতীন্দ্রিয় শক্তি বিধি করহ প্রদান,
আনন্দে এ সুরভির উপভোগি ঘ্রাণ।
চাহনি বুলায়ে যায় সর্ব্বাঙ্গে পুলক
একিরে পরাণ ঘেরা সজীব-কনক।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

মাদাম ব্লাভাস্কীর জীবন-কথা।

নিরুদ্দেশ।

ব্লাভাস্কী স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া সোজা-সুজি আবার টিফ্লিসে মাতামহের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্ত্তন দেখিয়া এবং উহার কারণ অবগত হইয়া সকলেই অবাক্ হইল। আত্মীয়বর্গ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, এক্ষণ উঁহাকে পিতার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। কর্ণেল হ্যান্ তখন দূরদেশে ছিলেন। তিনি ওদেসা নগরে আসিয়া কন্যা সহ সাক্ষাতের বাসনা করিলেন, এবং একজন ভৃত্য ও পরিচারিকা সঙ্গে পোটিবন্দর হইয়া বালিকা যাহাতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পিতা বুঝি আবার উদ্বাহ-বন্ধনের ছিন্ন গ্রন্থিগুলি পুনঃসংযোজিত করিয়া দেন—বালিকার মনে এই সন্দেহ উদয় হইল। তিনি ভীতা হইয়া পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। পোটি বন্দরে গিয়া পিতৃনির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার ষ্টীমার ধরিলেন না। বন্দরে ইংরাজের একখানা ক্ষুদ্র সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল। জাহাজখানির নাম 'কমোদর'। কমোদরের অধ্যক্ষকে প্রচুর অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া ব্লাভাস্কী স্বীয় অভীষ্ট-সাধনে তাহাকে সম্মত করাইলেন। জাহাজখানির পোটি হইতে কার্চ্চ ও তেগানরগ বন্দর দিয়া তুরস্ক দেশের রাজধানী কনস্তান্তিনোপলে যাইবার কথা। ব্লাভাস্কী কার্চ্চ পর্য্যন্ত টিকিট ক্রয় করিলেন। ইহাতে তিনি কার্চ্চবন্দরে অবতরণ করিবেন বলিয়া সকলের অনুমান হইল। জাহাজ কার্চ্চে আসিয়া পৌঁছিল। তিনি ভৃত্যদিগকে তাঁহার বাসোপযোগী একটী বাড়ী ঠিক করিয়া আবশ্যকীয় জিনিস-পত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিবার আদেশ দিয়া তীরে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা তীরে নামিয়া আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে চলিয়া গেল। ইত্যবসরে ব্লাভাস্কী পোতাধ্যক্ষকে দিয়া জাহাজ খুলাইয়া দিলেন। জাহাজ কার্চ্চ ত্যাগ করিয়া তেগানরগের দিকে ছুটিল, ব্লাভাস্কীও পিতার ভৃত্যদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

'কমোদর' তেগানরগে পৌঁছিলে তত্রত্য বন্দর-পুলিশ জাহাজে কোন অতিরিক্ত লোক আছে কিনা, অনুসন্ধান করিতে আসিল। লুক্কায়িত হওয়া ভিন্ন তখন আর উপায় ছিল না। কিন্তু লুকাইবার একমাত্র স্থান ছিল, জাহাজের কয়লার গুদামঘরটী। ব্লাভাস্কী জাহাজের বালক ভৃত্যটীকে তথায় লুকাইয়া রাখিয়া আপনি ঐ ভৃত্যের সাজে সজ্জিত হইলেন এবং পীড়ার ভাণ করিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। বিপদ এইরূপে কাটিয়া গেল। তারপর জাহাজ কৃষ্ণসাগরের মধ্য দিয়া কনস্তান্তিনোপলে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানেও নানা গোলযোগ আরম্ভ হইল। এ যাত্রা জাহাজের কোন কর্ম্মচারীর ইঙ্গিত ও সাহায্যে তিনি তাড়াতাড়ি একখানি ছোট ডিঙ্গি করিয়া একেবারে তীরে পলায়ন করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কনস্তান্তিনোপলে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিতা জনৈকা রুষ-মহিলার

সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইহাঁর নাম কাউণ্টেস্ কেসেলফ।* ইহাঁর সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ব্লাভাস্কী কিছুকাল ঈজিপ্ত ও পূর্ব্ব-ইয়ুরোপের গ্রীস প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ব্লাভাস্কীর ভৃত্যগণ কার্চ্চ হইতে টিফ্লিসে ফিরিয়া গিয়া আত্মীয়-বর্গের নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিল। তদবধি দশ বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহারা ব্লাভাস্কীর কোন সন্ধানই পান নাই। কেবল তিনি নিজে অতিগোপনে কখনও কখনও পিতাকে পত্র দিতেন এবং তাঁহার নিকট সময় সময় অর্থ-সাহায্যও পাইতেন। এইরূপ নিরুদ্দিষ্টা অবস্থায় ক্রমাগত সুদীর্ঘ দশ বর্ষ কাল ব্যাপিয়া সেই বালিকা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পৃথিবীর নানাস্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। সে সকল বৃত্তান্ত আমরা নিম্নে যথাসম্ভব বর্ণন করিতেছি। কিন্তু এই সুদীর্ঘ ভ্রমণের কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় নাই। কারণ তিনি নিজে ইহার কোন দৈনন্দিন লিপি রাখেন নাই, অপর কোন ব্যক্তিও তাঁহার সঙ্গে ছিল না, যদ্দ্বারা ঐ কার্য্য হইতে পারিত। তাঁহার বাল্য জীবনের কতক কতক ঘটনা তদীয়া ভগ্নী জেলিহোরাস্কী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এই "নিরুদ্দিষ্ট ভ্রমণ"পথে সেরূপ কোন ভগ্নী ভ্রাতা বা সঙ্গী ছিল না। বহুকাল গত হইলে তাঁহার মূল-জীবনী-লেখকের বিশেষ চেষ্টা-সত্ত্বেও ব্লাভাস্কী সকল কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পারিতেন না, বস্তুতঃ সে সকল স্মরণ করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহার কোন আগ্রহও ছিল না। বহুকালান্তে স্মৃতিকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা চলে না। কাজেই অনেক কষ্টে তাঁহার লুপ্তপ্রায় স্মৃতি হইতে যতটা সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহাই যথাসম্ভব অনুসন্ধান দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের একটী কঙ্কালমাত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে।

কর্ণেল হ্যান্ যখন দেখিলেন, কন্যাকে আর গৃহে ফিরাইতে পারিবেন না, তখন তাঁহাকে পুনরায় গার্হস্থ্য জীবনে আবদ্ধ করিবার সকল আশা পরিত্যাগ করিলেন। এমন কি, তাঁহার এই উচ্ছৃঙ্খল ভ্রমণের বিরুদ্ধেও কোন কথা বলিলেন না। পিতার নিকট কোন বাধা না পাইয়া ব্লাভাস্কী অপরাপর সকলের নিকট তাঁহার গতিবিধি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রাখিলেন। বোধ হয়,অজ্ঞাত-বাসের একটী কারণ,—স্বামী বা আত্মীয়বর্গ তাঁহার গতিবিধির সন্ধান পাইয়া পাছে তাঁহাকে পুনরায় গৃহাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করে, এই ভয়। জেনারল ব্লাভাস্কী মহোদয় ব্যাপার বুঝিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং শেষে এ বিবাহ-বন্ধন বিধিমত ছিন্ন করাই উচিত মনে করিলেন। হায়! মোহান্ধ আত্মপ্রতারিত বৃদ্ধ! ইহা তুমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারিলেই ভাল হইত। এ বিবাহ নামমাত্র, স্ত্রী পলাতকা ইত্যাদি কারণ দর্শাইয়া তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তদানীন্তন রুষীয়-রাজবিধি-অনুসারে তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না।

মাদাম ব্লাভাস্কী কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় পৃথিবীর ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু এই যথা-তথা উদ্দাম ভ্রমণের মধ্যেও একটী আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অন্তরে চির-জাগরূক ছিল। এই আকাঙ্ক্ষাই যেন তাঁহার জীবনের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশগুলির একটী

* সিনেটকৃত গ্রন্থে ইনিই 'কণ্টিণ্টেস কে'—বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। আমরা মিসেস্ বেশান্তকৃত "H P B and the Masters of Wisdom "নামক গ্রন্থে ইঁহার পূর্ণ নাম পাইলাম।

গ্রন্থন-সূত্র বিশেষ। এই আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রবল তত্ত্ব-জ্ঞান-লিপ্সা। তিনি যেখানেই যাইতেন, কোন অলৌকিক তত্ত্বের শিক্ষকের সন্ধান পাইলেই তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইতেন। মনস্তত্ত্বের অজ্ঞাত তত্ত্ব-রাশির দিকে তাঁহার এমনি ঝোঁক ছিল যে, সেই সকল আয়ত্ত করিবার উদ্দেশে উহাদের কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, অনেক সময় সে বিচার করিবার অবসরও তিনি গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া, বোধ হয়, তখন পর্য্যন্ত পরা-অপরা বিদ্যার প্রকৃত প্রভেদ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই—সে ভূয়ো-দর্শন ও জ্ঞান তখনও তাঁহার হয় নাই। তাই যে-খানেই কোন গুপ্ত বিদ্যার আলোচনা বা অনুষ্ঠান, সেই খানেই তিনি উপস্থিত, যে খানেই উহার কোন উপদেষ্টা আছে বলিয়া প্রকাশ, সেই খানেই তিনি বিদ্যার্থী হইয়া দণ্ডায়মান। এমন কি, তিনি ইন্দ্রজাল-ব্যবসায়ীদিগের নিকটও তত্ত্বানুসন্ধানার্থ যাইতেন। সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি কিছুতেই মুগ্ধ বা আসক্ত হইয়া পড়িতেন না। এই স্বাভাবিক গুণে এবং তাঁহার রক্ষক মহাত্মার কৃপায় তিনি নিকৃষ্ট বিদ্যা বা শক্তি লাভের লোভ হইতে সহজেই রক্ষা পাইতেন।

কাউণ্টেস কেসেলফের সঙ্গে ঈজিপ্ত ভ্রমণ কালে তদ্দেশীয় একটী বৃদ্ধ মুসলমানের সঙ্গে ব্লাভাস্কীর সাক্ষাৎ হয়। এই বৃদ্ধ কেইরো নগরে বাস করিত। তাহার খুব নাম, প্রচুর অর্থ-সম্পদ, অনেক ক্ষমতা। যাদুগীর বলিয়াও তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাহার ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে জন-সাধারণ যে সকল গল্প করিত, তাহা বিস্ময়কর। ব্লাভাস্কীকে শিষ্য রূপে পাইয়া ঐ ব্যক্তি বড়ই যত্ন করিতে লাগিল। তিনিও উহার শিক্ষা উৎসাহ সহকারে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশী-দিন শিক্ষা চলিল না, কারণ এবার তিন মাস ঈজিপ্তে ছিলেন। পর জীবনে আর এক বার এই ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঈজিপ্ত বাস কালীন জনৈকা উচ্চ-বংশীয়া ইংরাজ-মহিলার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় এবং উহার সঙ্গেও কিছু দিন ভ্রমণ করেন।

ভ্রমণের প্রথম বর্ষে ব্লাভাস্কী ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরীতে গমন করেন। পারীর তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। এই নগরের একজন সম্মোহন-বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি (mesmerist) ব্লাভাস্কীর আশ্চর্য্য মানসিক ক্ষমতার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া তাঁহাকে একটী পাত্ররূপে (subject) আপনবশে রাখিবার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আবদ্ধ করিবার শৃঙ্খল তখনও প্রস্তুত হয় নাই। তিনি এই আপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অবিলম্বে পারী পরিত্যাগ করিলেন। তার পর লণ্ডনে গিয়া পূর্ব্ব-পরিচিতা একজন রুষ-মহিলার সহিত কিছুদিন বাস করিলেন। এই তাঁহার দ্বিতীয় বার লণ্ডন-গমন। এবার তিনি একটী বড় হোটেলে থাকিতেন। তিনি বলেন, 'হোটেলটী নগর ও নদীরতীরের মধ্যবর্ত্তী, কিন্তু বাটীর নাম ও নম্বর এক্ষণ আমায় জিজ্ঞাসা করাও যা, আর আমার পূর্ব্ব জন্মের বসত বাটীর নাম-নম্বর জিজ্ঞাসা করাও তাই।'

এ যাত্রা লণ্ডন-বাস একটী বিশেষ ঘটনার জন্য তাঁহার স্মৃতিপটে চির অঙ্কিত ছিল। এ যাবৎ যাঁহাকে তিনি কখনও স্বপ্নে, কখনও ছায়ার মত অস্পষ্ট দেখিতেন, এই সময়ে জীবনে এই সর্ব্ব প্রথম সুস্পষ্ট স্থূলদেহে তাঁহার সেই রক্ষক মহিমাময় মহাপুরুষের দর্শন লাভ

করিলেন।* এক দিবস লণ্ডনের পথে বেড়াইতে বাহির হইয়া কতিপয় ভারতীয় রাজা এবং তাঁহাদের সঙ্গীয় একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ব্লাভাস্কীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি এই দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তিকে তাঁহার সেই ছায়াময় পরিরক্ষক বলিয়া চিনিতে পারিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি চিত্তের আবেগে তৎক্ষণাৎ তাঁহার দিকে ছুটিয়া যাইতে ও তাঁহার সহিত কথা বলিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সেই পুরুষ ইঙ্গিতে ব্লাভাস্কীকে অগ্রসর হইতে বারণ করিলেন। তিনি চলিয়া গেলেন, কিন্তু ব্লাভাস্কী মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরদিবস ব্লাভাস্কী একাকিনী হাইড পার্ক (Hyde Park) নামক উদ্যানে বেড়াইতেছেন এবং গত কল্যকার ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, সেই গম্ভীর-মূর্ত্তি ভারতবাসী হিন্দু তাঁহারই দিকে আগমন করিতেছেন। ব্লাভাস্কীর আর কোন সন্দেহ রহিল না যে,—সেই শান্তমূর্ত্তি তাঁহার আজন্ম-পরিচিত। তিনি নিকটে আসিয়া ব্লাভাস্কীকে বলিলেন, কোন গুরুতর কার্য্যোপলক্ষে রাজাদের সঙ্গে লণ্ডনে আসিয়াছেন। ব্লাভাস্কীকে স্থূল শরীরে দর্শন দিবার উদ্দেশ্য, কোন কার্য্যে তাঁহার সহযোগিতার প্রয়োজন। কি কার্য্য, তাহাও কিছু কিছু বলিলেন। ব্লাভাস্কীকে অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, এবং উক্ত কার্য্যে প্রস্তুত হইবার জন্য তাঁহাকে তিন বৎসর হিমালয় তিব্বতাঞ্চলে বাস করিতে হইবে।

সুবিখ্যাত জেকব বোহমের (Jacob Bohme) জীবনেও এইরূপ একটী ঘটনার কথা শুনা যায়। জেকব একজন চর্ম্মকারের দোকানে কার্য্য শিক্ষা করিতেছিলেন। এক দিন কোথা হইতে জনৈক অদ্ভুত রকমের ক্রেতা আসিয়া বালক জেকবকে হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া বলিল, তাঁহার দ্বারা জগতে অনেক মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে, এবং কিরূপে সেজন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহাও বালককে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেল।

যাহা হউক, মহাপুরুষের উপদিষ্ট কার্য্যে দীক্ষিত হইতে বোধ হয় তখনও ব্লাভাস্কীর বিলম্ব ছিল। কেননা, তখনও তাঁহার ভ্রমণবাসনা ও দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। ফেনিমোর কুপারের (Fennimore Cooper) উপন্যাস পাঠ করিয়া উত্তর আমেরিকার অসভ্যদিগকে দেখিবার জন্য তাঁহার একান্ত বাসনা হইল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি তদুদ্দেশ্যে কানাডার দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় পহুঁছিয়া কতকগুলি বন্য নর-নারীর সহিত মিশিয়া খুব আনন্দের সহিত উহাদের আচার ব্যবহার ও ঔষধাদির প্রয়োগ-প্রণালী বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাহারা চলিয়া গেলে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার কয়েকটা জিনিষ নাই। তিনি কথাবার্ত্তায় এরূপ নিমগ্ন ছিলেন যে, এ ব্যাপার কিছু মাত্র লক্ষ্য করেন নাই। বনবাসীদের এরূপ নীচ প্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়া তাহাদের সম্বন্ধে যে সকল কল্পনা হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন, তাহা

* কাউণ্টেস ওয়াচ্‌মিষ্টার (Countess Wachtmeister) কৃত Reminiscences of H. P. Blavatsky নামক গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ব্লাভাস্কীর স্বলিখিত একখণ্ড পুরাতন স্মারক-লিপিতেও ইহার বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

তিবোহিত হইল। তৎপর তিনি নিউ অর্লিয়ন দেশে গমন করিয়া তথাকার 'ভুদু' নামক এক সম্প্রদায় কাফ্রির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইহারা এক প্রকার মিশ্র জাতি, ওয়েষ্ট ইণ্ডিস (West Indies) দ্বীপপুঞ্জে বাস করে এবং ইন্দ্রজাল ব্যবসা করে বলিয়া খ্যাত। ভুদুদিগের শক্তি-সামর্থ্যে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গগণ বড় বিশ্বাস করিতেন না বটে, কিন্তু আবার উহাদিগকে বিলক্ষণ ভয় করিয়াও চলিতেন, কখনও উহাদের নিকটে যাইতে সাহসী হইতেন না। মাদাম ব্লাভাস্কীর গুপ্তবিদ্যা লাভের সবল কিন্তু অন্ধ বাসনা উহার মধ্যে কোন্‌টী 'সু', কোন্‌টী 'কু', ইহাও তাঁহাকে বিচার করিয়া দেখিতে দিত না। তিনি ভুদুদিগের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের বিদ্যানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। হয় ত তিনি ঐ সকল লোকের অনিষ্টকর সংসর্গে আসক্ত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু যিনি শৈশব হইতে অসীম প্রভুত্বের সহিত তাঁহাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন, সেই চিরপরিচিত মূর্ত্তি আবার তাহার রক্ষার্থ আবির্ভূত হইলেন। ভুদুদিগের সংসর্গে মিশিয়া নিজের কি ভয়ানক অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছেন—একদিন সে বিষয়ে তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নূতন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

এবার মেক্সিকো (Mexico) প্রদেশে চলিয়া গেলেন। সে দেশে তখন ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব। নানা উপদ্রব অশান্তি সত্ত্বেও তিনি ইহার অনেক স্থান দেখিয়া লইলেন। এই বিপদ-সঙ্কুল পর্য্যটনে স্বীয় স্বাভাবিক নির্ভীকতাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। তবে সময়ে সময়ে কেহ কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার উপকার করিত। তিনি বলিতেন যে, একজন বৃদ্ধ কানাডাবাসীর নিকট তিনি বড়ই কৃতজ্ঞ। ঐ অঞ্চলে যখন তিনি একেবারে সঙ্গীহীন হইয়া পড়েন, তখন এই লোকটীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বৃদ্ধ তাঁহাকে অনেক আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

ব্লাভাস্কীর এই আমেরিকা ভ্রমণের সময় প্রচুর সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হয়। তাঁহার কোন ধর্ম্ম-মাতা মৃত্যুকালীন অশিতি সহস্র মুদ্রা তাঁহাকে দান করিয়া যান। বোধ হয়, টাকাটা ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প পরিমাণে তাঁহাকে দিলেই ভাল হইত, কারণ মিতব্যয়িতায় তিনি একান্তই অনভ্যস্ত ছিলেন। দেশ বিদেশ ভ্রমণকালীন নানা বিপদে পড়িয়া অর্থের অসচ্ছলতা বশতঃ তাঁহাকে সময় সময় বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, সত্য, কিন্তু তজ্জন্য তিনি কিছুমাত্র কাতর হইতেন না। দুঃখ দারিদ্র্যকে যে তিনি বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করিতেন না, ইহা তাঁহার জীবনে পুনঃ পুনঃ দেখা গিয়াছে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যদি কখনও প্রচুর পরিমাণ অর্থলাভ হইল, ত উহা দুই হস্তে উড়াইয়া দিয়া তবে শান্তি লাভ করিতেন। যে আশি হাজার টাকা তিনি প্রাপ্ত হন, তাহা যে কিসে ব্যয়িত হইল, সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিতেন না। তবে আমেরিকাতে কিছু ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন সত্য। এ ভূমি ক্রয়ও তাঁহার অন্য দশটা বাজে খেয়াল সদৃশ ক্ষণিক ও স্থিরতর উদ্দেশ্য-হীন। ইহাও তাঁহার চিত্তের একটা সাময়িক বুদ্বুদ মাত্র। ভূমি খণ্ড যে কোথায় অবস্থিত, শেষে কিন্তু ইহাও তিনি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। আর ক্রয়-সম্পর্কীয় কাগজ পত্র সমস্তই হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। যিনি

প্রভূত সম্ভ্রম ও সম্পদকে পদদলিত করিয়া সুখ-বিলাস-পূর্ণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পৃথিবীর অনির্দ্দিষ্ট বন্ধুর পথে নানা দুঃখ ক্লেশ সানন্দে স্বেচ্ছায় সহ্য করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ নিস্পৃহতা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বৈরাগ্যবান হৃদয়ে বিত্ত-তৃষ্ণা স্থান পায় না।

মেক্সিকো ভ্রমণের সময় তিনি ভারতবর্ষে আসিতে মনস্থ করেন। তাঁহার পরিচালক মহাত্মা একটা কোন মহাপুরুষ-মণ্ডলীর অন্তর্গত, ইহা তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই ধারণা ছিল। সেই শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ববিদ্যার মহান্ শিক্ষকমণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ এক মাত্র ভারতের উত্তর খণ্ডেই সম্ভব—এ বিশ্বাসটীও তাঁহার অন্তঃকরণে, কি জানি কেন, সদাই জাগরূক ছিল। ভারতে আসিবার উদ্দেশ্যে তিনি জনৈক পরিচিত ইংরাজ ভদ্রলোকের নিকট পত্র লিখিলেন। এই ব্যক্তির সঙ্গে দুই বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মানি দেশে তাঁহার আলাপ হয়। ব্লাভাস্কী অভীষ্ট বস্তুর অনুসন্ধানে যে পথে ঘুরিতেছেন, ইনিও সেই পথের পথিক। ব্লাভাস্কী ইঁহাকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিসে আসিতে লিখিলেন,—তথা হইতে দুই জনে মিলিয়া প্রাচি পথে যাত্রা করিবেন, স্থির করিলেন। ইংরেজটী যথা সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের সহিত আর একটী লোক মিলিত হইল। ইনি হিন্দু, ব্লাভাস্কীর সহিত পূর্ব্বে ইহার একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই তিন জন তত্ত্ববিজ্ঞার্থী উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া সিংহলে আসিলেন, এবং তথা হইতে বোম্বাই আগমন করিলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ব্লাভাস্কী ভারতে পদার্পণ করিলেন।

বোম্বাইয়ে আসিয়া তিন জন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। কর্ত্তব্য-প্রণালী লইয়া একটু মতভেদ হওয়ায় প্রত্যেকেই আপন পথ অবলম্বন করিলেন। ব্লাভাস্কী নেপালের ভিতর দিয়া স্বয়ং তিব্বত প্রবেশের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ও যাত্রা নিষ্ফল হইল। অন্যান্য বাধা বিঘ্ন ছাড়া নেপালের ইংরাজ-প্রতিনিধি মহাশয় বিশেষ প্রতিবন্ধক জন্মাইয়া ছিলেন। সুতরাং তিনি পুনরায় দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসিলেন। তৎপর জাবা ও সিঙ্গাপুর দ্বীপ হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন।

১৮৫৩ খ্রীঃ ইংলণ্ডে ক্রিমিয় সমরের জন্য আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছিল। রুষিয়াবাসীর পক্ষে তখন ইংলণ্ডে থাকা বড় সুবিধাজনক ছিল না। স্বদেশানুরাগিনী ব্লাভাস্কীর ইহা বড়ই অপ্রীতিকর হইল। ঐ বৎসরের শেষভাগে তিনি পুনরায় আমেরিকা চলিয়া গেলেন। এবার নিউইয়র্ক হইয়া বরাবর পশ্চিমাভিমুখে গমন করত প্রথমে সিকাগো, তৎপর 'রকি' পর্ব্বতমালা উত্তীর্ণ হইয়া সান্-ফ্রান্সিস্কো নগরে উপনীত হইলেন। এ যাত্রায় তিনি আমেরিকায় প্রায় দুই বৎসর ছিলেন। তারপর আর একবার ভারতবর্ষের দিকে ফিরিলেন। এবার জাপানের পথে আগমন করেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ কলিকাতায় পৌঁছিলেন।

পর বৎসর লাহোর ভ্রমণকালীন তাঁহাকে একজন জর্ম্মাণ ভদ্রলোক ধরিয়া ফেলেন। এই ভদ্রলোকটী তাঁহার পিতার পরিচিত। ইনি প্রাচ্যযোগ-রিত্যাদির অনুসন্ধান-কল্পে দুইটী বন্ধুসহ ভারত-পর্য্যটন করিতেছিলেন, কর্ণেল হ্যান ইহাঁকে স্বীয় গৃহত্যাগিনী কন্যার একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে অনুরোধ করেন। এক্ষণ এই চারিজনে একত্র মিলিত হইয়া ভ্রমণ

করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা তাতার জাতীয় একজন 'সামান'—অর্থাৎ ফকীরের সঙ্গে কাশ্মীর রাজ্যের ভিতর দিয়া লাদকের অন্তর্গত লেলি নামক স্থানে উপনীত হইলেন। ফকীর ইহাঁদিগকে একটা বৌদ্ধ-ধর্ম্মমন্দিরের ভিতর লইয়া গিয়া যোগশক্তির নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকটী অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইলেন। অতঃপর ইহাঁরা তিব্বত-প্রবেশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু কেহই তদ্দেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ না থাকায় ইহাঁদিগকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। যাহা হউক, একমাত্র ব্লাভাস্কী ভিন্ন অপর তিন জনকে বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে হইল না। তিনি বলেন,—'আমরা এই রহস্যময় প্রাচ্য-ভূমির ষোল মাইল পথও অতিক্রম করি নাই, এমন সময় সঙ্গিগণের মধ্যে দুই জনকে ব্রিটিশ সীমান্তে ফিরিয়া আসিতে হইল, আর শ্রীযুক্ত কে—মহাশয় (বোধহয় ইনিই ব্লাভাস্কীর পিতৃ-পরিচিত সেই ভদ্রলোক) ভ্রমণারম্ভেই জ্বরে এরূপ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন যে, আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে কাশ্মীর দিয়া পুনরায় লাহোরে লইয়া যাওয়া হইল।'

ব্লাভাস্কী ইহাতে পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না। তাতার-ফকীরের সহায়তায় তিনি একাকিনী তিব্বতের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ফকীর তাঁহাকে একটা ছদ্মবেশ পরাইয়া নির্ব্বিঘ্নে ব্রিটিশ-সীমান্ত পার করাইয়া সেই দুর্গম দেশে লইয়া চলিল। ব্লাভাস্কী-প্রণীত 'আইসিস অন্‌ভিল্ড' (Isis unveiled)—অর্থাৎ 'তত্ত্বার্থ—প্রকাশ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই তিব্বত-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে একটী অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

তাতারী সামান বা ফকীরেরা বাম বাহুতে একটা মন্ত্রপূতঃ প্রস্তর-নির্ম্মিত কবচ ধারণ করিয়া থাকে। ব্লাভাস্কী বলিতেছেন :—

"আমরা প্রায়ই (সেই কবচটী লক্ষ্য করিয়া) আমাদের পথপ্রদর্শক ফকীরকে জিজ্ঞাসা করিতাম,—'এটী তোমার কি কাজে লাগে, এটীর কি গুণ?'

এ প্রশ্নের উত্তরে ফকীর কখনও সঠিক কিছু বলিত না। কেবল বলিত, সুযোগ মিলে তখন প্রস্তরখণ্ডই প্রশ্নের উত্তর দিবে। এরূপ অনিশ্চিত আশায় আমাদের মনে নানা জল্পনা কল্পনার উদয় হইতে লাগিল।

যাহা হউক, অবিলম্বেই প্রস্তরখানার কথা বলিবার দিন সমাগত হইল। আমাদের জীবনে এ একটা ভয়ঙ্কর পরীক্ষার দিন। আমরা গৃহসম্পর্কশূন্য, আশ্রয়হীন,—ভ্রমণকারীর বেশে এমন একটা স্থানে উপস্থিত, যেখানে সভ্যতার নাম গন্ধ নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্য জীবনের স্থিরতা নাই। সেদিন একজন লামা —অর্থাৎ তিব্বতীয় বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী—দুই মাইল দূরে কোন গৃহস্থের বাটীতে ভূত তাড়াইতেছিল। এই ভূতটা নাকি গৃহের দ্রব্য-সামগ্রী কতক ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, কতক উড়াইয়া দিয়াছিল। নরনারী সকলেই এই ভূতাপসরণ-ক্রিয়া দেখিতে চলিয়া গিয়াছে। আমাদের তাঁবু তখন জনশূন্য। তাঁবুটীতে আমরা দুই মাসের অধিক কাল সেই পার্ব্বত্যদেশে বাস করিতেছিলাম। সেই নীরব নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে, সেই জনহীন মরুতুল্য শৈলভূমিতে একটা তাতারী ফকীর আমার একমাত্র-রক্ষক। আমি এই সুযোগে তাহাকে কবচের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলাম। ফকীর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রথমে যেন একটু দ্বিধা করিল; অতঃপর কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া আপনার মেষচর্ম্মাসন হইতে উঠিয়া বাহিরে

গেল। তাঁবুর বাহিরে একটা কাষ্ঠদণ্ড প্রোথিত করিয়া তদুপরি প্রকাণ্ড-শৃঙ্গ-বিশিষ্ট একটা শুষ্ক ছাগমুণ্ড স্থাপন করিল। তারপর ভিতরে আসিয়া তাঁবুর পশমী পর্দ্দাটী ফেলিয়া দ্বার আবৃত করিয়া আমাকে বলিল, আর কেহ এ গৃহে প্রবেশ করিতে সাহস করিবে না,—ঐ বহিঃস্থ ছাগমুণ্ড দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইল, ফকীর এক্ষণ 'কাজে আছে'। তৎপর ফকীর স্বীয় বক্ষোপরি হস্ত স্থাপন করিয়া একটী আখরোটের ন্যায় সেই ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড বাহির করিল এবং সযত্নে সেটীকে আবরণোন্মুক্ত করিয়া যেন গিলিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড় হইয়া গেল, জীবন-স্রোত যেন রুদ্ধ হইল। ফকীরের দেহ মৃতের ন্যায় শীতল ও অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর-দানচ্ছলে তাহার অধরোষ্ঠ মাত্র ঈষৎ প্রকম্পিত হইত,—জীবন-চিহ্ন স্বরূপ সেই স্পন্দনটুকু না দেখিলে সেদিন হয়ত ওরূপ দৃশ্য আমার দারুণ সন্দেহ, এমন কি বিষম ভয়ের কারণ হইয়া উঠিত। সূর্য্য অস্তমিত-প্রায়, চতুর্দ্দিক নীরব নিস্তব্ধ। যদি তখন তাঁবুমধ্যস্থিত নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিশিখার মৃদুমন্দ আলোকটুকু না থাকিত, তাহা হইলে সেই গভীর অন্ধকারে চতুর্দ্দিকের বিরাট নিস্তব্ধতা মিলিয়া গিয়া এক ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি করিত। আমরা পাশ্চাত্য-দেশের উপত্যকায় উপত্যকায় ভ্রমণ করিয়াছি, দক্ষিণ কষিয়ার অনন্ত প্রান্তর মধ্যে বাস করিয়াছি, কিন্তু মঙ্গলিয়ার সেই বালুকাময় মরুপ্রদেশের সান্ধ্য-নিস্তব্ধতা কাহারও সহিত তুলনীয় নহে। এখানে তবু সামান্য বসবাস আছে, কিন্তু আফ্রিকার মরু ত একেবারে জীবশূন্য। তথাপি সেই ঊষর নির্জ্জীব আফ্রিকা-মরুক্ষেত্রেও ভীষণ নীরবতা মঙ্গলিয়া মরুর সহিত তুলনীয় নহে। আমি তখন এরূপ স্থানে একাকিনী। একটা শবতুল্য নরদেহ মাত্র আমার পার্শ্বে মৃত্তিকোপরি শয়ান। সৌভাগ্য যে এ অবস্থা বেশী ক্ষণ থাকে নাই।

ফকীরের দেহ মৃৎশয্যায় শায়িত। সহসা যেন মেদিনীর উদর গহ্বর হইতে গম্ভীরস্বরে নিনাদিত হইল,—'মাহাদু! তোমার মঙ্গল হউক। বল, তোমার কি কাজ আমায় করিতে হইবে?'

ঘটনা অতীব লোমহর্ষণকর বটে, কিন্তু আমরা ইহার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। কেন না, ইতিপূর্ব্বেও আমরা কয়েক বার সামান ফকীরদিগের অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপ প্রত্যক্ষাবলোকন করিয়াছি। আমি মনে মনে বলিলাম—'আপনি যিনিই হউন, একবার শ্রীমতী—কে—এর নিকট যাউন, এবং এক্ষণে তিনি কি ভাবিতেছেন, আমায় বলুন। দেখুন তিনি কি করিতেছেন, এবং তাঁহাকেও বলুন আমরা কেমন আছি—কি করিতেছি?'

তদ্রূপ গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল,—'আমি এক্ষণ সেই স্থানে, বৃদ্ধা রমণী বাগানে বসিয়া আছেন; তিনি চশমা পরিয়া একখানা চিঠি পড়িতেছেন।'

আমি পেন্‌সিল ও নোট বহি লইয়া তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলাম 'পত্রে কি লেখা আছে, শীঘ্র বলুন।' পত্রের কথাগুলী আস্তে আস্তে উচ্চারিত হইতে লাগিল। আমি রুমেনিয় (পত্রোক্ত) ভাষা বুঝিতাম বটে, কিন্তু লিখিতে জানিতাম না। তাই যেন সেই অদৃশ্য পুরুষ আমাকে কথাগুলি ধ্বন্যানুসারে (phonetically) লিখিয়া লইবার উপযুক্ত সময় দিবার জন্যই ইচ্ছা পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সম্পূর্ণ এক পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়া গেল।

অতঃপর সেই তাতার ফকীর যেন একটু ভগ্ন স্বরে বলিলেন,—'পশ্চিমের দিকে একবার দৃষ্টিপাৎ কর,—তাঁবুর তৃতীয় দস্তটীর দিকে একবার চাহিয়া দেখ! তোমার সেই রমণীর চিন্তামূর্ত্তি ওখানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখ।'

সহসা সবেগে সামানের মস্তক কম্পিত হইয়া যেন একটু ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। কিন্তু আবার যেন ভারাক্রান্ত হইয়া নিম্নে আমারই চরণমূলে পড়িয়া গেল। সামান আমার পদদ্বয় তাহার উভয় হস্তে জড়াইয়া ধরিল। অবস্থা ক্রমশঃ বড়ই ক্লেশকর হইয়া উঠিল। কিন্তু আমার কৌতূহল-বৃত্তি তখনও সমান প্রবল। সেই কৌতূহল বশেই আমার সাহস একেবারে লুপ্ত হয় নাই। পশ্চিম কোণে চাহিয়া দেখিলাম, আমার পুরাতন বন্ধু সেই রুমোনীয়া মহিলার সুপরিচিত মূর্ত্তি। তাঁহার দেহ যেন নীহার সদৃশ উপাদানে গঠিত, ঈষৎ কম্পমান চঞ্চল, কিন্তু তিনি আমার সম্মুখে সুস্পষ্ট দণ্ডায়মান।

আবার সেই গম্ভীর স্বরে ব্যক্ত হইল,—'রমণীর চিন্তামূর্ত্তি মাত্র এখানে, কিন্তু তাঁহার স্থূল দেহ এক্ষণে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় স্বস্থানে পড়িয়া আছে, কেননা অন্য উপায়ে এ স্থানে তাঁহাকে আনা অসম্ভব।'

আমি সেই ছায়া-মূর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় সহকারে একটীবার কথা কহিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচলিত হইল, আকৃতির নানা ভঙ্গিতে যেন কতই ভয় ও দুঃখের ভাব প্রকাশিত হইল। কিন্তু সেই ছায়াময় ওষ্ঠাধর হইতে একটী শব্দও স্ফুরিত হইল না। তবে আমার মনে হইতেছিল,—বোধ হয়, ইহা কল্পনা মাত্র,—যেন দূর হইতে এই কথা কয়েকটী আমার কাণে আসিতেছে—'ইহা হইতে পারে না।'

সেই ফকীরের সূক্ষ্ম শরীরই যে আমার ইচ্ছানুসারে দূর দূরান্তর ভ্রমণ করিতেছিল, তাহাতে আমার মনে কোন সন্দেহ রহিল না। ইহার দশমাস পরে সেই নোট-বহির লিখিত কাগজ খানি সমেত এক খণ্ড পত্র আমার সেই রমণীর বন্ধুর নিকট লিখিলাম। এই পত্রে ঘটনাটী সবিস্তার বর্ণনা করিয়া জানিতে চাহিলাম, তিনি স্বয়ং ঐ দিবস কি করিতেছিলেন? পত্রের উত্তরও পাইলাম। তিনি লিখিলেন,—'আমি সে দিন সকাল বেলা (মঙ্গলিযায় অপরাহ্ণ কাল) বাগানে বসিয়া মোরব্বা প্রস্তুত করিতেছিলাম। তুমি যে কাগজখণ্ড পাঠাইয়াছ,তাহা আমার ভ্রাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানা পত্রের অবিকল নকল,—একটী কথারও এদিক্ ও দিক্ হয় নাই। বসিয়া থাকিতে থাকিতে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম এবং তদবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম, যেন তোমার সহিত একটা মরুস্থানে সাক্ষাৎ হইয়াছে, আর তুমি একজন ঐন্দ্রজালিকের তাঁবুর ভিতর বসিয়া আছ।' তিনি উক্ত মরুভূমি ইত্যাদির যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ, সঠিক, ও যথাযথ।

পুনরায় পরীক্ষার্থ ফকীরের অন্তর্দৃষ্টি আমার অপর কোন বন্ধুর দিকে পরিচালিত করিলাম এবং আমাকে এখান হইতে কোন নিরাপদ স্থলে লইয়া যাইতে বন্ধুকে অনুরোধ জানাইলাম। আমি সঠিক জানিতে পারিয়াছি, ইনি অর্থাৎ আমার এই বন্ধু আমার সেই বিপত্তিসঙ্কুল অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত হইয়াছিলেন, কারণ, ইহার ঘণ্টা কয়েক পরেই সাহায্য প্রাপ্ত হইলাম। প্রায় পঁচিশ জন অশ্বারোহী পুরুষ তাহাদের প্রভুর আজ্ঞায়

আমার রক্ষার্থ আমাদের সেই মরুশিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দূর হইতে আমাদের অবস্থা জানিতে পারিয়া সেই দুর্গম স্থানে প্রবেশ করিতে পারে, ইহা কোন সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই অশ্বারোহী দলের নেতা ছিলেন, একজন 'সেরাবণ' বা যোগসিদ্ধ ব্যক্তি। ইঁহাকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, পরেও আর দেখিলাম না, কেননা ইনি স্বীয় 'সুময' অর্থাৎ আশ্রম ত্যাগ করিয়া বাহিরে আইসেন না। আমিও তাঁহার আশ্রমের প্রবেশ-পথ জানিতে নারি নাই। কিন্তু ইনি আমার বন্ধুর একজন পরম সুহৃদ্।

ঘটনা বর্ণনান্তে ব্লাভাস্কী লিখিয়াছেন, "যাঁহারা সূক্ষ্ম শরীরের অসীম ক্ষমতার বিষয় অবগত আছেন—যাঁহারা বিশ্বাসী—আমি তাঁহাদের জন্যই এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলাম। সাধারণ পাঠক ইহাতে অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না। এই ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের জানা আছে যে, সামানের সূক্ষ্মদেহ স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করে নাই, কারণ সামান স্বয়ং সিদ্ধ পুরুষ নহে, মিডিয়ম।' মিডিয়মকে অপরের আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হয়।*

এই ঘটনাতেই মাদাম ব্লাভাস্কীর এবারকার তিব্বত-ভ্রমণ সমাপ্ত হইল। তিনি পুনরায় ব্রিটিশ সীমান্তে আনীত হইলেন। এবার এমন সকল পথ ও গিরি-সঙ্কট দিয়া আসিলেন, যাহা তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। অতঃপর আরও কিছু দিন ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহি-বিদ্রোহের কিছু পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সেই তত্ত্ব-জ্ঞান-গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এ দেশ পরিত্যাগ করিলেন। মান্দ্রাজ হইতে যবদ্বীপে আগমন করিলেন, এবং তথা হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ুরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ব্লাভাস্কী আপন লক্ষ্যানুসরণ করিয়া পর্ব্বতে, প্রান্তরে, নগরে, মরুস্থলে, সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতেছেন, আর এদিকে সংবাদ পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে নানা অযথা কথা প্রকাশিত হইতেছিল। তিনি তখনও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন মতবাদ প্রকাশ করেন নাই, তখনও কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে অনুকূল বা প্রতিকূল সমালোচনা করেন নাই যে, তদবলম্বনে তাঁহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সাধারণের কিছু বলিবার থাকিতে পারে। তথাপি অলস গল্পবাগীশদিগের কল্পনা তাহার সম্বন্ধে নানা অলীক উপন্যাসের সৃষ্টি করিতেছিল। এই সকল উপন্যাস অলীকত্বে কেবল হাস্যোদ্দীপক নহে, কিন্তু স্থানে স্থানে নিন্দাসূচকও বটে। তাঁহার কোন আত্মীয় লিখিয়াছেন,—"আমরা একটু একটু শুনিতে পাইলাম যে, জাপান, চিন, কনস্তান্তিনোপল এবং সুদূর প্রাচ্যভূমির আরও কোন কোন স্থানে তাঁহাকে কেহ কেহ নাকি দেখিয়াছে। তিনি ইউরোপের ভিতর দিয়া বহুবার যাতায়াত করিয়াছেন, কিন্তু কোন খানেই অধিক দিন বাস করেন নাই। অথচ কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল, তিনি ভিয়েনা, বার্লিন, ওয়ারসা ও পারী নগরের উচ্চনীচ সকলেরই সুপরিচিত! ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান নগর গুলির আবালবৃদ্ধ সকলেই তাহাকে চিনে এবং ঐ ঐ স্থানে অমুক অমুক ঘটনায় তিনি লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু সেই সব ঘটনার সময়ে তিনি আদৌ ইয়ুরোপেই ছিলেন না। কোন কোন পত্রে তাঁহাকে নানা অবজ্ঞাসূচক নামে অভিহিত করা হইল। কেহ লিখিল, মাদাম হিলয় ব্লাভাস্কী হাঙ্গেরির রাষ্ট্রবিপ্লবে কৃষ্ণ হুসার সৈন্য-

* Isis unveiled – Vol – II, page 628.

দলের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন, এবং ইনি যে স্ত্রীলোক,তাহা অনেকেই বুঝিতে পারে নাই,—১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহা কেহই জানিত না। বস্তুতঃ মাদাম হিলেনা ব্লাভাস্কী বলিয়া কোন জীবের অস্তিত্ব ছিল না। কয়েক বৎসর পরে পারীনগরের একখানা কাগজে লিখিল—'ইনি পোলজাতীয়া, ককেসাসে থাকেন—১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পোল রাষ্ট্রবিপ্লবে অনেক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, অবশেষে অর্থাভাবে বাধ্য হইয়া হোটেলে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করেন।' বস্তুতঃ সে সময়ে কিন্তু ব্লাভাস্কী টিফ্লিস নগরে আপন গৃহে চুপচাপ বসিয়া আছেন।"

এরূপ অলীক কুৎসার মূল কোথায়, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। পরজীবনে তাঁহাকে যে সকল অতিরঞ্জিত উক্তি ও নিন্দাবাদের লক্ষ্যভূত হইতে হইয়াছিল, তাহাও এইরূপ ভিত্তিহীন বটে, কিন্তু তাঁহার উৎপত্তিমূলে যে যথেষ্ট পরিমাণে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ বর্ত্তমান ছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, কেননা, তখন তিনি সমাজ-বিশেষ-প্রচলিত মতবাদের খণ্ডনে নিযুক্ত থাকায় অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। অতএব আমরা দেখিতে পাই, কি সকারণে, কি নিষ্কারণে, আজীবন কল্পিত নিন্দার লক্ষ্যভূত হওয়া যেন তাঁহার একটা ভাগ্যনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মভোগ ছিল। পাঠককে এস্থলে উহারই কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদত্ত হইল।

যাহা হউক, ব্লাভাস্কীর এই ভ্রমণ-ব্যাপার অন্যদিকেও একটু প্রণিধান-যোগ্য। এদিকটী তাঁহার অনবদ্য চারিত্রিক অংশের অন্তর্গত। এই তরুণী অবলার স্বাধীন ভ্রমণে সে অংশটী কি রূপ উদ্ভাসিত? যখন তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন তিনি সংসার-অনভিজ্ঞা একাকিনী সপ্তদশ বর্ষীয়া বালা। যেরূপে এই তরুণ-বয়স্কা রমণী সম্পূর্ণ সহায়হীন, বন্ধুহীন, আশ্রয়হীন অবস্থায় আফ্রিকার অসভ্য এবং উচ্চ আমেরিকার বন্যজাতি হইতে তুষারমণ্ডিত তিব্বতের পর্ব্বতাধিবাসী এবং মঙ্গলিয় মরুর তাতারী পর্য্যন্ত—সুসভ্য ইয়ুরোপ হইতে বর্ব্বর ওয়েষ্ট-ইণ্ডিস পর্য্যন্ত ক্রমাগত দশবর্ষ কাল নানাদেশে নানা জাতীয় লোকের সহিত অবাধে মিশিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসিলেন, ইহা অন্তঃপুরসীমাতিরোহিনীর প্রতি উত্তেজিত-সন্দেহ-যুক্ত, অবরোধ-রক্ষিত-শুদ্ধতা-পক্ষপাতী এদেশীয়দিগের কথা দূরে থাকুক, স্বাধীনতার ক্রোড় লালিত পাশ্চাত্য নরনারীগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। ব্লাভাস্কী সাধারণ ইয়ুরোপীয়ের ন্যায় অহঙ্কারবশে জাতিবর্ণের বিচার করিয়া কাহাকেও বর্জ্জন করিতেন না। তিনি সভ্য-অসভ্য, মূর্খ-পণ্ডিত, উচ্চ-নীচ, অন্ত্যজ ভদ্র, সকল সমাজে মিশিতেন, কিন্তু কোথাও কাহারও প্রভাব তাহার ব্যক্তিত্বের বিনাশ সাধন করিতে পারে নাই,—তাঁহার তেজোময়ী প্রকৃতির নির্ম্মলতার উপর এতটুকু দাগ বসাইতে পারে নাই। বরং তাঁহার অসাধারণত্ব সর্ব্বত্র আপন প্রভাব বিস্তার করিত। এই নিরাশ্রয়া রমণীর অসীম নির্ভীকতা, তাঁহার যদৃচ্ছা ভ্রমণের এক প্রধান অবলম্বন ছিল, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহা ছাড়া তাঁহার প্রকৃতি-নিহিত আর একটী শক্তি তাহাকে সর্ব্বাপদ হইতে রক্ষা করিত। এটী আর কিছুই নহে,—তাঁহার চরিত্রের অপূর্ব্ব নৈতিক-বল। কোন প্রকার নীচ আসক্তি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না, পাপ-পঙ্কিল প্রবৃত্তিমার্গে তাহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। তিনি আজীবন সংযত-চরিত্রা, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা। এই নৈতিক বলই

তাঁহার জীবন-পথের সম্বল ছিল। চারিত্র্য-বল রূপ বর্ম্মে আবৃত হইয়া, নির্ভীকতাকে অগ্রদূত করিয়া, জ্ঞানের কৃপাণ হস্তে, তিনি যাবতীয় বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া চলিতেন।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

বর্ষা।

দলে বলে কোথায় রয়েছ চোখ রাঙ্গিয়ে গর্জ্জে'
মেঘেরা ঐ এল সেজে গ্রীষ্ম-ত্রাসী শৌর্য্যে।
চড়া-বাঁধা বালির তীরে,
শীর্ণা নদীর কাল নীরে,
রেখা-বাঁধা হিল্লোলেতে ছায়া কাঁপে ত্রস্তে,
গোঁ গোঁ করে বায়ু, শৈল-কূলের কানন ধ্বস্তে।
আয়রে বৃষ্টি আকাশ ভেঙ্গে,
দিশে-হারা ধরায় নেমে,
পিপাসিত পরিশ্রান্ত হাঁপিয়ে পড়া বিশ্বে,
ভিজিয়ে দে যা তাপের জ্বালা শিলা ভূমির দৃশ্যে।
স্মরণা ভরে কাণায় কাণায়,
বাণ ছুটিয়ে শুকন ডাঙ্গায়,
টৈটুম্বুর কর নদী, আয়রে ধেয়ে মর্ত্তে,
রসে সিক্ত মৃত দেহ উঠুক বেঁচে বর্ত্তে।

হাজার অ বর্জ্জনার চাপে,
দীর্ঘ ব্যাপী তীব্র তাপে,
কুঁচ্‌কে গেছে শুকিয়ে গেছে মোদের আশা-ভর্সা,
চল নামিয়ে মুসল ধারে আয়রে নেমে বর্ষা।
ভাসিয়ে আবর্জ্জনার পালা,
ধুয়ে মুছে দুঃখ জ্বালা,
ধারে ছুটে খর ধারে গাঙ্গে তুলে বন্যা।
মড়া হবে সঞ্জীবিত, ধরা হবে ধন্যা।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ইতিহাসে কবিত্ব।

ভারতবর্ষের ইতিহাস এক নাওয়ারিষ্-মাল। যাঁহার যখন যেরূপ খেয়াল হইয়াছে, তিনি তাহা ভারতেতিহাসের নামে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সংপ্রতি কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা" নাম দিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।* এই প্রবন্ধটী কবিবরের খেয়াল ও কল্পনার এক অদ্ভুত খিচুড়ী। পাঠকবর্গকে তাহার একটু আস্বাদ লইতে অনুরোধ করিতেছি।

সকলেই জানেন, কবিবর রবীন্দ্রনাথকে লইয়া কলিকাতার সাহিত্যিকদের মধ্যে কিছু কাল যাবৎ ঘোর দলাদলি চলিতেছে। সেই জন্য কবিবর দলাদলি ও বিরোধকে একটা চিরন্তন সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তাই দলাদলি ও বিরোধ তাঁহার কাছে "অত্যন্ত সত্য" হইয়া দেখা দিয়াছে। সেই জন্য তাঁহার প্রবন্ধের ধুয়া (Keynote) হইতেছে, কেবল বিরোধ—বিরোধ—বিরোধ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস যে বিরোধ ও যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস, একথা সত্য; কোন্ দেশের ইতিহাস নয়? আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি, অতি প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে আর্য্য ও অনার্য্য

* এই প্রবন্ধ কলিকাতার চৈতন্য লাইব্রেরীর একটী সভায় পঠিত হয়, পরে গত বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

জাতির মধ্যে একটা বিরোধ অনেক দিন চলিয়াছিল; পরে কালক্রমে সে দলাদলি মিটিয়া গেল। আর্য্য-জাতি প্রবল হইয়া অনার্য্যদিগকে বনে জঙ্গলে তাড়াইয়া দিলেন,—এখনও তাহাদের বংশধরগণ কোল, ভীল, সাঁওতালাদিরূপে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের বনে জঙ্গলে বাস করিতেছে। আর কতকগুলি অনার্য্য জাতি আর্য্যাচার ও আর্য্য-সভ্যতা গ্রহণ করিয়া কালক্রমে আর্য্য-সমাজের সহিত মিশিয়া গেল। ইহারাই সম্ভবতঃ শূদ্র নামে পরিচিত হইয়াছে।

আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে এই বিরোধ ভিন্ন আর এক বিরোধ ঘটিয়াছিল রামায়ণের যুগে। আর্য্য ক্ষত্রিয়বীর রামচন্দ্র বানর ভল্লুকাদি নামে পরিচিত কতকগুলি অনার্য্যজাতির সাহায্যে রাক্ষসাধিষ্ঠিত লঙ্কা আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সীতাপহারী রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া জানকীর উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন আর এক বিরোধ ঘটিয়াছিল, মহাভারতের যুগে। সে কুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের জ্ঞাতিবিরোধের ইতিহাস। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য নরপতিগণ এই দুই পক্ষের কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁহাদের অনেকেই বিনষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষভাবে থাকিয়া এই ভীষণ যুদ্ধ থামাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, পরে তাহাতে অসমর্থ হইয়া দুর্য্যোধনকে সেনা-সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং নিজে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এইরূপে আমরা স্থূল দৃষ্টিতে ভারতেতিহাসে যে সকল বৃত্তান্ত দেখিতে পাই, কবিবর রবীন্দ্রনাথ অতি সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা তাহাদের মধ্য হইতে আরও কতকগুলি বিরোধ ও দলাদলি আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিচার প্রণালীতে কালগত পৌর্ব্বাপর্য্য বা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, তিনি যে ধারা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা কালের ধারা নহে, ভাবের ধারা। ("ইহা কালগত যুগ নহে, ভাবগত যুগ।") কিন্তু ভাবের ধারা শ্রাবণের ধারার মত আকাশ হইতে পড়ে না, কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ দ্বারা ঘটনা-পরম্পরায় ঘাত-প্রতিঘাত হইতে উৎপন্ন হয়। আমরা দেখাইব, রবীন্দ্রনাথ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া ঘটনার পরম্পরাকে ওলট পালট্ করিয়াছেন, এবং অনেক সময়ে "হাল ছাড়িয়া" দিয়া স্বীয় প্রখর কল্পনা-শক্তির সাহায্যে নূতন ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যে সকল বিরোধ ও দলাদলির আবিষ্কার করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী লইয়া আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

১। ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের বিরোধ।

২। রামায়ণের যুগে রামচন্দ্রকে লইয়া মস্ত দলাদলি, যাহার ফলে রামের বনবাস।

৩। মহাভারতের যুগে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া দলাদলি, যাহার ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।

৪। অনার্য্য দেবতা শিবের সহিত ব্রাহ্মণদের বৈদিক দেবতা রুদ্রের বিরোধ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা দেখিব, বাস্তবিক এই সকল দলাদলি ও বিরোধের কোন প্রমাণ আছে, না এগুলি কবি-কল্পনা-প্রসূত?

রবীন্দ্রনাথের মতে ব্রাহ্মণগণের সহিত অনার্য্যদিগের এক মহা বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। ক্ষত্রিয়গণ অনার্য্যদিগের সহিত মিলিত হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগের সহিত ক্ষত্রিয়দিগের ঘোর শত্রুতা আরম্ভ হইল। ক্ষত্রিয়দিগের নেতা ছিলেন জনক, বিশ্বামিত্র,

ও রামচন্দ্র। ব্রহ্মবিদ্যাটা বিশেষ ভাবে ক্ষত্রিয়েরই বিদ্যা। ব্রাহ্মণগণ কেবল নিষ্ফল হোম, যাগ, যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড লইয়া থাকিতেন।

আমরা কিন্তু চিরদিনই জানি, যুদ্ধ বিদ্যাটা ক্ষত্রিয়েরই বিদ্যা ছিল। ব্রাহ্মণগণকে বড় কেহ যুদ্ধ করিতে দেখে নাই। তবে বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, সে তপোবলে যুদ্ধ। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের তপোবলে পরাস্ত হইয়া নিজে ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। আর যুদ্ধ করিয়াছিলেন পরশুরাম। তাঁহার সহিত ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ হইয়াছিল, কোন অনার্য্য-জাতির যুদ্ধ হইয়াছিল, বলিয়া জানি না। মহাভারতের সময়ে দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাও অনার্য্য-জাতির সঙ্গে নহে, পাণ্ডবদিগের সঙ্গে। তাহা হইলে, অনার্য্যজাতির সহিত আর্য্য-জাতির যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ত ক্ষত্রিয় আর্য্যজাতিই করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণগণ অবশ্য যাগ যজ্ঞ তপস্যা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তাহা হইলে অনার্য্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয়দিগের ব্রাহ্মণ জাতির সহিত বিরোধ করা কিরূপ সম্ভবপর হয়?

জনক চিরদিন ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি বলিয়া পরিচিত। তিনি ব্রাহ্মণদের বিরোধী ছিলেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? বরং বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাই, তিনি যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিদিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটা যজ্ঞ করিতেন, তাহাতে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা হইত।

"জনকো বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে তত্র হ কুরুপাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণা অভি-সমেতা বভূবুঃ" ইত্যাদি।

এখানে মারামারি কাটাকাটির ত কোন চিহ্ন দেখি না।

বিশ্বামিত্রের একজন মাত্র ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের সহিত হোমধেনু লইয়া বিবাদ হইয়াছিল। ইহাতে কি রূপ বুঝিব যে, বিশ্বামিত্র অনার্য্য-দিগের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? তারকা রাক্ষ-সীকে যদি অনার্য্য ধরা যায়, তবে ত বরং দেখি, বিশ্বামিত্র সেই অনার্য্য নারীকে মারি-বার জন্য রামচন্দ্রকে লইয়া গিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র রাবণাপহৃতা পত্নীর উদ্ধার সাধ-নার্থ বানর ভল্লুকাদি নামে পরিচিত কতক-গুলি অনার্য্য জাতির সহিত মিলিত হইয়া-ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ জাতির সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? তাঁহার যে যুদ্ধঘোষণা, তাহাও সেই অনার্য্য রাক্ষসের বিরুদ্ধে।

ক্ষত্রিয়গণ যদি যুদ্ধ বিদ্যা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, আর ব্রাহ্মণগণ কেবল যাগ যজ্ঞ তপস্যা লইয়া থাকিতেন, তবে ব্রহ্ম বিদ্যা কেবল ক্ষত্রিয়কেই আশ্রয় করিবেন, এ কেমন কথা? ব্রহ্ম বিদ্যার সহিত নরহত্যার কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে কি? তাহা হইলে আধুনিক সমরপ্রিয় জাতি সকল—ইংরেজ, রুষ, জাপানী, ইঁহারাই যথার্থ ব্রহ্মবিৎ। উপনিষৎ কিন্তু অন্য রূপ সাক্ষ্য দেন। মুণ্ড-কোপনিষৎ বলেন—

"ব্রহ্মাদেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্ম বিদ্যাং সর্ব্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠাং
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ॥
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা
অথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥"

বিশ্বের কর্ত্তা ও ভুবনের পালয়িতা ব্রহ্মা দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা কহিয়াছিলেন। ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে যাহা কহিয়াছিলেন, অথর্ব্বা পূর্ব্বে সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরকে বলিয়াছিলেন। তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় সত্যবাহকে বলিয়াছিলেন, ভারদ্বাজ সত্যবাহ পরম্পরায় পরাবর সর্ব্ববিদ্যা বিষয়ে ব্যাপ্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরসকে বলিয়াছিলেন।

শৌনকো মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ। কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।"

মহাগৃহস্থ শৌনক অঙ্গিরসের সমীপে যথাবিধি উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্, কি জানিলে এই সমস্ত জানা হয়?

"তস্মৈ স হোবাচ। দ্বেবিদ্যে বিদিতব্য ইতি হস্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরাচ।"

তিনি তাঁহাকে বলিলেন, ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন দুই বিদ্যা, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা।

"তত্রাপরো ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণম্ নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথপরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

ইহাদের মধ্যে ঋগবেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ—এসকল অপরা বিদ্যা। আর পরা বিদ্যা হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা, যাহা দ্বারা অক্ষর (ব্রহ্মকে) জানা যায়।

এস্থলে আমরা দেখিতেছি, ব্রহ্মা হইতে জাত অথর্ব্ব, অঙ্গির, সত্যবাহ, অঙ্গিরস, এই সকল ঋষিগণই পরম্পরাক্রমে ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ দিতেছেন। ইঁহারা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই শ্রুতির এই অংশ চোখের সম্মুখে রাখিয়া লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্ম বিদ্যা বিশেষ ভাবে ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা হইয়া উঠিয়া ঋক যজুঃ সাম প্রভৃতিকে অপরা বিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম কাণ্ডকে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে।"

কিন্তু অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সাহিত্য-সম্রাটও নিজের থিওরী বা কল্পনার এতদূর অধীন হইয়া পড়িয়াছেন যে, শ্রুতির বিকৃত অর্থ প্রচার করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন নাই। শ্রুতির উদ্ধৃতাংশে আমরা এক ব্রাহ্মণকেই পাপ ও অপাপ, এই উভয় বিদ্যার উপদেশ দিতে দেখিতেছি। এখানে ক্ষত্রিয়ের নাম গন্ধও নাই।

রবীন্দ্রনাথ যাহাকে নিষ্ফল কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, এই শ্রুতিই কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকার অর্জ্জনের নিমিত্ত তাহার অনুষ্ঠান করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন।

"মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যৎ
তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে॥"

বেদমন্ত্রে ঋষিগণ যে সকল কর্ম্ম দেখিয়াছিলেন, তাহা হোতা অধ্বর্য্যুঃ উদ্‌গাতা, এই ত্রিবিধ ঋত্বিগ্‌গণের যজ্ঞে নানা প্রকারে বিস্তৃত হইয়াছে। তোমরা সত্যকাম হইয়া সেই সমস্ত আচরণ কর, ইহাই তোমাদের নিজকৃত কর্ম্মের ফল-প্রাপ্তির পন্থা।

এই সকল কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠান করিবার

উপদেশ দিয়া শ্রুতি বলিতেছেন, কিন্তু ইহাই চরম নহে। এই সকল কর্ম্ম করিলে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি হইবে, কিন্তু অবিদ্যানাশ বা মুক্তি হইবে না। এই সকল কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত-ভোগ পরিতৃপ্তি দ্বারা নির্ম্মল হইলে বিবেক বৈরাগ্যের উদয় হইবে, তখন ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃত কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

কর্ম্মলব্ধ স্বর্গাদি-লোক সকল পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য লাভ করিবেন। সেই সকল কর্ম্ম দ্বারা নিত্য পদার্থ লাভ করা যায় না। সেই নিত্য বস্তু জানিবার জন্য তখন তিনি সমিৎ হস্তে বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবেন।

"তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্ত চিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥"

ব্রহ্মবিদ্যাশীল গুরু সেই সম্যক্ রূপে প্রশান্ত চিত্তে শমগুণান্বিত সমুপগত শিষ্যকে যদ্দ্বারা সেই অক্ষর সত্যপুরুষকে জানা যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাবৎ বলিলেন।

প্রশ্নোপনিষদে দেখিতে পাই—

"সুকেশা চ ভরদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ সৌর্য্যায়নী চ গার্গ্যঃ কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধী কাত্যায়ন স্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরংব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্‌পলাদ মুপসন্নাঃ।

ভরদ্বাজ পুত্র সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, সৌর্য্যপুত্র গার্গ্য, অশ্বলপুত্র কৌশল্য, ভৃগু-পুত্র বৈদর্ভি, কত্যপুত্র কবন্ধী, ইঁহারা ব্রহ্ম-পরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন, ইঁহারা পরব্রহ্মের অন্বেষণপর হইয়া 'ইনি আমাদিগের সেই সমস্ত বলিবেন' ইহা ভাবিয়া ভগবান্ পিপ্‌-পলাদের নিকট সমিৎ হস্তে উপস্থিত হইলেন।

বলা বাহুল্য, ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। যাগযজ্ঞ করিতে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকারী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থে সমিৎপাণি সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ইঁহারা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন না, তাহার প্রমাণ ইঁহাদের কথাতেই বুঝা যায়। ইঁহা-দের মধ্যে একজন পিপ্‌পলাদকে বলিলেন—

"অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত। ষোড়শকলং পুরুষং বেত্থ।"

ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা পিপ্‌পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্, কোশলবাসী হিরণ্যনাভ নামক এক রাজপুত্র আমার নিকট আসিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন "হে ভরদ্বাজ পুত্র! তুমি ষোড়শ কলাবিশিষ্ট পুরুষকে জান কি?"

সুতরাং দেখা গেল, ক্ষত্রিয় রাজকুমার ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য এই ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ-পুত্র সুকেশার নিকট আসিয়াছিলেন। অত-এব "একদিন ক্ষত্রিয়েরাই সমস্তই অনৈক্যের অভ্যন্তরে একই যে সত্যপদার্থ, ইহা অনুভব করিয়াছিলেন" এই কবির উক্তি কল্পনা-প্রসূত নহে কি?

আরও দেখিতেছি, সমগ্র শ্রুতির মধ্যে অনেক অনেক ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এক মাত্র বৈদেহ জনক রাজা ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া সুপরিচিত।

এতদ্ভিন্ন পুরাণ-সাহিত্যে বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্ম-বিদ্যালাভের নিমিত্ত তপস্যা করিতে দেখা যায়, গায়ত্রী মন্ত্রের তিনিই দ্রষ্টা, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শুধু এই দুই জন মাত্র ক্ষত্রিয়কে ব্রহ্মবিদ্যা-বিশারদ দেখিয়া, ব্রহ্ম-বিদ্যাটা ক্ষত্রিয়েরই বিদ্যা, এরূপ অদ্ভুত মত ঘোষণা করা অতি দুঃসাহসের কার্য্য নহে কি?

আবার আরও একটী কথা। শ্রুতি পুনঃ পুনঃ বলেন, তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায়।

"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম"—মুণ্ডকোপনিষৎ

তৈত্তিরিয় উপনিষদে আছে—

"ভৃগুর্বৈ বরুণিঃ বরুণং পিতরমুপ সসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।

বরুণপুত্র ভৃগু পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ভগবন, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিন।"

"তং হোবাচ, তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি।"

পিতা ভৃগুকে বলিলেন "তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম।"

এই প্রসঙ্গে বরুণ পুত্রকে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভের জন্য তপস্যা করিতে বলিতেছেন। এতদ্দ্বারা আমরা দেখিতেছি, শ্রুতি যে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতেছেন, তাহা লাভ করিবার জন্য তপস্যার প্রয়োজন; এই যাগ যজ্ঞাদি তপস্যা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। সুতরাং ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা, ইহা কিরূপে বলা যায়? এই শ্রুতি-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবিদ্যা-লাভ করিতে তপস্যার প্রয়োজন হইত। তবে আধুনিক ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের স্বতন্ত্র নিয়ম। তাহার অধিকারী অনধিকারী বিচার নাই, ইচ্ছা করিলেই তাহা লাভ করা যায়।

এস্থলে অধিকার ভেদ কথাটা আসিয়া পড়িল। শাস্ত্রের মতে অধিকারিভেদ জীবের ক্রমোন্নতির সোপান। উল্লিখিত মুণ্ডকোপনিষদে ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। তাহাতে দেখিয়াছি, ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী যে সে হইতে পারে না। বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ও সেই কর্ম্মোচিত স্বর্গাদি ভোগ করিতে করিতে বিবেক বৈরাগ্যাদির উদয়ে চিত্ত প্রশান্ত হইলে তবে ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু কবিবর রবীন্দ্রনাথ এই অধিকার তত্ত্বের সম্পূর্ণ এক মৌলিক ব্যাখ্যা বাহির করিয়াছেন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন "হাল ছাড়িয়া দেওয়া নীতি।" অর্থাৎ আর্য্য ও অনার্য্যের অনৈক্যকে কল্পনা-কাহিনী ও পূজা-পদ্ধতির সাহায্যে আদ্যোপান্ত মিলাইবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার মধ্যে শত সহস্র অসঙ্গতি থাকিয়া গেল। সে সকল অসঙ্গতির কোন প্রকার সমন্বয় হয় না দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ নিয়ম করিলেন, যাহার যেরূপ শক্তি ও প্রবৃত্তি, সে সেইরূপ পূজা আচার লইয়া থাকুক! তাঁহার এই কথা কতক পরিমাণে সত্য। যাহার দ্বারা যে কার্য্য হইবার নহে, তাহাকে জোর করিয়া সেই কার্য্য করিতে বাধ্য করা অপেক্ষা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে সকলকে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি দেওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। কিন্তু ইহাতে হাল ছাড়িয়া দেওয়া হইল কি রূপে? কোন বিদ্যালয়ে এম্-এ ক্লাস হইতে আরম্ভ করিয়া এ, বি, সি, ডির ক্লাস পর্য্যন্ত শ্রেণী-বিভাগ দেখিয়া হয় ত কোন কল্পনা-কুশল পরিদর্শক বলিবেন, ইহাও হাল ছাড়িয়া

দেওয়া নীতি। গোড়ার সকল বিদ্যার্থীকে এক ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া তাহাদিগকে Differential calculus এর পাঠ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অধ্যাপক যখন দেখিলেন, তাঁহার অধ্যাপনাতে অধিকাংশ ছাত্রেরই নিদ্রাকর্ষণ ও মুখ ব্যাদান হয়, তখন তিনি নিয়ম করিলেন "যাও তোমরা সব ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে—আমি তোমাদিগকে ঐক্যসূত্রে বন্ধন করিতে না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিলাম।"

এবার রামায়ণের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যা'ক। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটী অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন।

১। রামায়ণের স্থূল বিষয় হইতেছে প্রাচীন সমাজ বিপ্লব, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বনাম ক্ষত্রিয়, এই দলাদলি। রামচন্দ্র নূতন দলের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধাচারী ক্ষত্রিয়দলের পক্ষ হইয়াছিলেন। "বশিষ্ঠ বংশই ছিল তাঁহার চির পুরাতন পুরোহিত বংশ। তথাপি অল্প বয়সেই রামচন্দ্র বশিষ্ঠের বিরুদ্ধপক্ষ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বিশ্বামিত্র রামকে তাঁহার পৈত্রিক অধিকার হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন।"

এখন একথা যদি সত্য হয়, তবে বশিষ্ঠ অবশ্য কিছুতেই স্বেচ্ছায় রামকে বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করিতে দিতে পারেন না। কিন্তু রামায়ণ যদি মানিতে হয়, তবে আমরা ইহার ঠিক বিপরীত ঘটনা দেখিতেছি। বিশ্বামিত্র যজ্ঞ-বিঘ্নকারী রাক্ষস বধ করিবার জন্য রামকে লইতে দশরথের নিকট আসিলেন। পুত্রবৎসল দশরথ কিছুতেই রামচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিতে চাহেন না। তখন স্বয়ং বশিষ্ঠই রামকে বিশ্বামিত্রের সহিত পাঠাইবার জন্য দশরথকে অনুরোধ করিতেছেন।

"তেনাস্য মুনিমুখ্যস্য ধর্ম্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
ন কিঞ্চিদস্ত্যবিদিতং ভূতং ভব্যঞ্চ রাঘব॥
এবংবীর্য্যো মহাতেজো বিশ্বামিত্রো মহাযশঃ।
ন রাম গমনে রাজন্ সংশয়ং কর্ত্তুমর্হসি॥
তেষাং নিগ্রহণে শক্তঃ স্বয়ং চ কুশিকাত্মজঃ।
তব পুত্রহিতার্থায় ত্বামুপেত্যাভিযাচতে।
ইতি মুনি বচনাৎ প্রসন্ন চিত্তো
রঘুবরভশ্চ মুমোদ পার্থিবঃ।
গমনমভিরুচোয রাঘবস্য
প্রথিতযশাঃ কুশিকাত্ম জায বুদ্ধ্যা॥"
রামায়ণ—আদিকাণ্ড, ২১শ সর্গ।

"অতএব রাঘব! ভূত বা ভবিষ্যৎ, কোন মন্ত্রই এই ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মুনিবরের (বিশ্বামিত্রের) অবিদিত নাই। রাজন্! এই মহতেজা, মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র এবম্বিধ প্রভাবসম্পন্ন, অতএব রামকে আপনি ইঁহার সঙ্গে গমনের অনুমতি দিতে সংশয় করিবেন না। অধিক আর কি বলিব, এই কৌশিক বিঘ্নমিত্র একাই সেই রাক্ষসদিগের সংহারে সমর্থ, তবে কেবল ইনি আপনার পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াই আপনার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিতেছেন।" প্রখ্যাতকীর্ত্তি রঘুকুলতিলক নৃপতি দশরথ মহামুনি বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে প্রদান করা উচিত, এরূপ স্থির করিয়া প্রসন্নচিত্তে রামকে বিশ্বামিত্রের সহিত যাইবার অনুমতি দিতে অভিলাষী হইলেন।"

ইহাই কি বিশ্বামিত্রের রামকে তাঁহার পৈত্রিক অধিকার হইতে "ছিনাইয়া" লওয়া? তাহা হইলে যে সকল মুগ্ধ পিতা তাঁহাদের পুত্রগণকে বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রেরণ করেন, তাঁহাদিগকে সাবধান হইতে বলি। আর বিশ্বামিত্র রামকে তাঁহার পৈত্রিক অধিকার হইতে ছিনাইয়া লইলে, রাম-বনবাসের পালা এখানেই সাঙ্গ হইল না কেন?

এখানে আমরা আরও একটী ঘটনা দেখিতেছি। বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের হোমধেনু লইয়া পূর্ব্বে যে ঘোরতর বিবাদ হইয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। সে বিবাদ সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া গিয়াছে। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের অভিপ্রায় বিফল করিতে চেষ্টা না করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিতে বিশেষ সাহায্য করিলেন। তাঁহার বিনা সাহায্যে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে লইয়া যাইতে পারিতেন কিনা, সন্দেহ। সুতরাং যে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধকে অবলম্বন করিয়া কবির চিরন্তন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের গিঁওরী খাড়া করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

২। রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক লইয়া অযোধ্যায় একটা প্রবল দলাদলি হইয়াছিল, ইহাও আর একটী কবি কল্পনা। কবির বলেন—"অকস্মাৎ যৌবরাজ্যে অভিষেকে বাধা পড়িয়া রামচন্দ্রের যে নির্ব্বাসন ঘটিল, তাহার মধ্যে সম্ভবতঃ তখনকার দুই প্রবলপক্ষের বিরোধ সূচিত হইয়াছে। রামের বিরুদ্ধে যে একটী দল ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ অত্যন্ত প্রবল—এবং সম্ভবতঃ মহিষীদের প্রতি তাহার বিশেষ প্রভাব ছিল।"

রামায়ণের পাঠকমাত্রেই জানেন, মহর্ষি বাল্মীকি এরূপ দলাদলির কথা বিন্দুবিসর্গও লেখেন নাই। রামের বিরুদ্ধে আবার একটী প্রবল দল? ইহা রবীন্দ্রনাথের কল্পনা। রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই, মহারাজ দশরথ বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার মনস্থ করিয়া সমস্ত নগরবাসী, জনপদবাসী ও অধীনস্থ নৃপতিবৃন্দকে এক বিরাটসভায় আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদের নিকট নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদের মতামত জানিতে চাহিলেন। ইহার উত্তরে তাঁহারা সকলে একমত হইয়া একবাক্যে রামের বহুবিধ গুণের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মত দিলেন। তাঁহাদের শেষ কথা এই,—

"বলমারোগ্যমায়ুশ্চ রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
দেবাসুর মনুষ্যেষু সগন্ধর্ব্বোরগেষু চ॥
অশংসতে জনঃ সর্ব্বে রাষ্ট্রেপুরবরে তথা।
আভ্যন্তরশ্চ বাহ্যশ্চ পৌরজানপদো জনঃ॥
প্রিয়ো বৃদ্ধা গুরুণ্যাশ্চ সায়ংপ্রাতঃ সমাহিতাঃ।
সর্ব্বান্ দেবান্ নমস্যন্তি রামস্যার্থে মনস্বিনঃ॥
তেষাং তদযাচিতং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সমৃধ্যতাম্।
রামমিন্দীবরশ্যামং সর্ব্বশত্রুনিবর্হনং।
পশ্যামো যৌবরাজ্যস্থং তব রাজোত্তমাত্মজম্।"

অযোধ্যাকাণ্ড—তৃতীয় সর্গ।

"অধিক কি, দেবদানব গন্ধর্ব্ব-উরগ ও মানবগণের মধ্যে সকলেই সেই সর্ব্বজনবিদিত শ্রীরামের পরমায়ু, বল, আরোগ্য কামনা করিয়া থাকে, এবং কি পুরবাসী কি রাষ্ট্রবাসী, কি জনপদবাসী, অন্তরঙ্গ বা বহিরঙ্গ সকল ব্যক্তিই, এমন কি বৃদ্ধা ও তরুণী স্ত্রীলোকেরাও সমাহিত হইয়া তাঁহার যৌবরাজ্যে অভিষেক কামনায় প্রত্যহ প্রভাত ও সায়ংকালে দেবতাদিগকে নমস্কার করে। আপনার প্রসাদে তাহাদের এই প্রার্থনা ফলবতী হউক—আপনার পুত্র শত্রুনিধনকারী ইন্দীবর-শ্যাম রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত অবলোকন করিতে আমাদের সকলেরই বাসনা হইয়াছে।"

বলা বাহুল্য, এখানে দলাদলির কোন চিহ্ন নাই। মহারাজ দশরথ সকলের অভিপ্রায় অনুসারে অভিষেকের আয়োজন করিতে বশিষ্ঠকে আদেশ করিলেন। অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। অযোধ্যা-

নগরীর প্রতিগৃহ আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত এবং পুষ্পমাল্য ও পতাকায় পরিশোভিত হইল। সেই সমগ্র রাজ্য, নগর ও অন্তঃপুর মধ্যে কেবল একটী প্রাণীর এই নয়নাভিরাম দৃশ্য অসহ্য হইল। সে হইতেছে কৈকেয়ীর কুব্জা দাসী মন্থরা। প্রথমে কৈকেয়ীও তাহার নিকট রামের অভিষেকবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন এবং এমন কি, হর্ষাবেগে মন্থরাকে "দিব্য আভরণ" উপহার দিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে মন্থরার কু-পরামর্শে কৈকেয়ীরও মতিচ্ছন্ন ঘটিল। কিন্তু দশরথের সাড়ে শাত শত মহিষীর মধ্যে আর একজনও কৈকেয়ীর সহিত যোগদান করেন নাই। বরং দেখিতে পাই, রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনগমনোদ্যত হইয়া দশরথের অনুমতি প্রার্থনা করিতে আসিলে সেই সকল মহিষী "হা রাম" "হা রাম" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন।

"স্ত্রী সহস্র নিনাদশ্চসঞ্জজ্ঞে রামবেশ্মনি।"
হা হা রামেতি সহসা ভূষণ ধ্বনি মিশ্রিতং॥

আবার দেখিতে পাই—

"দেব্যঃ সমস্তা করুণঃ সমেতা
স্তাং বর্জ্জয়িত্বা নবদেবপত্নীম।"

অর্থাৎ কেবল একমাত্র কৈকেয়ী ব্যতীত অপর সমস্ত মহিষীগণ মিলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইহাই কি রামের বিরুদ্ধ দলের "মহিষীদের" প্রতি প্রভাব?

আর সেই "বিরুদ্ধদল" রামের বনগমনে কি করিল? এরূপ একটা বিরুদ্ধদল থাকিলে অবশ্য মহর্ষি বশিষ্ঠ তাহার নেতা হইবেন, কারণ ইতিপূর্ব্বে বিশ্বামিত্র রামকে এই বশিষ্ঠের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা সেই ক্ষত্রিয়-বীরকে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই বশিষ্ঠই রাম-সীতার সহিত বনগমনে উদ্যত হইলে জনসাধারণের মুখপাত্র-স্বরূপ কৈকেয়ীকে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন, শুনুন:—

"অথযাস্যতি বৈদেহী বনং রামেণ সঙ্গতা।
বয়মপ্যনুযাস্যামঃ পুরং চেদং গমিষ্যতি॥
অন্তঃপালাশ্চ যাস্যন্তি সদারো যত্ররাঘবঃ।
সহোপজীব্যং রাষ্ট্রঞ্চপুরঞ্চ সপরিচ্ছদং॥
ভরতশ্চ সশত্রুঘ্নশ্চীরবাসা বনে চরঃ।
বনে বসন্তং কাকুৎস্থমনুবৎস্যতি পূর্ব্বজম্॥
ততঃ শূন্যাং গতজনাং বসুধাং পাদপৈঃ সহ।
ত্বমেকা সাধি দুর্ব্বৃত্তা প্রজানামহিতে রতা॥
নহিতদ্ধবিতা রাষ্ট্রং যত্ররামো ন ভূপতিঃ।
তদ্বনং ভবিতা রাষ্ট্রং যত্ররামো নিবৎস্যতি॥
* * * * * * * *
লোকে নহি স বিদ্যেত যোন রাম মনুব্রতঃ।
ব্রহ্মস্বদ্যৈব কৈকেয়ি পশুব্যালমৃগদ্বিজান্।
গচ্ছতঃ সহ রামেন পাদপাংশ্চ তদুন্মুখান্॥

অর্থাৎ—"সীতা যদি রামের সহিত মিলিত হইয়া বনেই যান, তবে আমরা ইঁহার সঙ্গে যাইব, অপর পুরবাসী সমস্ত লোকই ইহাঁদের সঙ্গে যাইবে। রঘুনন্দন রাম সপত্নীক যেখানে যাইবেন, অন্তঃপুর-রক্ষক এবং পুর ও রাষ্ট্রনিবাসী প্রাণিগণও ধন ধান্যাদি লইয়া দাস দাসীর সহিত তথায় যাইবে। অপিচ বোধ হইতেছে, ভরতও শত্রুঘ্নের সহিত চীর বসন ধারণ করিয়া বনচর হইয়া এই বনবাসী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাকুৎস্থ রামের সহিত বাস করিবেন। অতএব প্রজাদিগের মন্দনিরতে কুচরিতে! তোমাকে একাকিনীই এই মনুষ্যশূন্য বৃক্ষপূর্ণ অযোধ্যা শাসন করিতে হইবে। রাম যে রাজ্যে রাজা থাকিবেন না, তাহা রাজ্য থাকিবে না, অর্থাৎ বন হইবে এবং যে বনে রাম বসতি করিবেন, তাহা রাজ্য হইবে। * * * কৈকেয়ি, রামের অনুগত নহে, অধুনা ইহলোক

এরূপ এক ব্যক্তিও নাই, তুমি এখনই দেখিতে পাইবে যে,পশু পক্ষী মৃগ ও সর্পেরাও রামের অনুগমন করিবে এবং বৃক্ষেরা ও তাঁহার অনুগমনোন্মুখ হইবে।"

বাস্তবিক হইলও তাহাই। রাম বন গমন করিলে অযোধ্যার কি দশা হইল, তাহা মহাকবি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,

"রামে বনং প্রব্রজিতে নগরং প্রচ্চালতৎ॥
দিশেঃ পর্য্যাকুলাঃ সর্ব্বা স্তিমিরেণেবসবৃতা।
ন গ্রহো নাপি নক্ষত্রং প্রকাশেন কিঞ্চন।
অকস্মান্নাগর সর্ব্বো জনো দৈন্যমুপাগমৎ।
আহারে বা বিহারে যা ন কশ্চিদকয়োন্নঃ।
অযোধ্যায়াং জন সর্ব্বশ্চ কোপজগতীপতিম্॥
বাষ্পপর্য্যাকুলমুখো রাজমার্গগতো জনঃ।
ন হৃষ্টো লভ্যতে কশ্চিৎ সর্ব্বঃ শোকপরায়ণঃ।

অর্থাৎ রাম বন গমন করিলে অযোধ্যা কম্পিত হইল, দিক্ সকল ঘোর তিমিরে আচ্ছন্ন হইল, গ্রহ নক্ষত্র ভরিয়া গেল, নগরবাসিগণ আহার বিহার পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত শোকাবিষ্ট হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং রাজা দশরথের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। যে রামের বনগমনে অযোধ্যার সমস্ত নরনারী, এমন কি, পশু পক্ষী তৃণলতা পর্য্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিল, তাঁহাকে লইয়া আবার দলাদলি?

৩। এই রামায়ণ সম্বন্ধে আরও একটী আজগুবী খবর শুনুন। রামচন্দ্র বনে গিয়া—"দক্ষিণে কৃষিস্থিতিমূলক সভ্যতা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ক্রমে দারুণ শৈবধর্ম্ম ও ভক্তি ধর্ম্মের রূপ গ্রহণ করিল।"

ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কথা অনেক শুনিয়াছি। রামায়ণের লাঙ্গলিক ব্যাখ্যা এবার নূতন শুনিলাম। লাঙ্গলিক ব্যাখ্যা বুঝিলেন কি? Agricultural interpretation. তাহা এই কৃষিস্থিতি-মূলক সভ্যতা বিস্তারের প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হইল। রামচন্দ্র যে শাপগ্রস্তা ঋষিপত্নী অহল্যার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তিনি ঋষিপত্নী ছিলেন না। অহল্যা মানে হালের অর্থাৎ চাষের অযোগ্য ভূমি, গৌতম ঋষি সেই ভূমিখণ্ড আবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিলেন, তাহা প্রস্তরাকীর্ণ। তাই তিনি চাষের অনুপযুক্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন—অর্থাৎ অহল্যা পাষাণী হইয়া রহিল। পরে রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের সহিত বনে গিয়া সেই ভূমিখণ্ডকে চাষের উপযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বনে আরও কত প্রস্তরাকীর্ণ ভূমি থাকিতে কেবল সেই ভূমিখণ্ড কেন আবাদ করিলেন, আর তিনি একাই চাষ করিলেন, না অপর বিখ্যাত চাষী ব্রহ্মর্ষি জনক রাজাকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। তবে রাজর্ষি জনকের যে ইহাতে যোগ ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। কারণ অহল্যা উদ্ধারের পরেই রাম বিশ্বামিত্রের সহিত জনক ভবনে গমন করেন। যদি জনকের ইহাতে যোগ না থাকে, তবে বলরামের যে যোগ ছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ বলরাম কাঁধে লাঙ্গল লইয়া বেড়াইতেন। এই সিদ্ধান্তে কালের ধারা ঠিক না থাকিলেও ভাবের ধারা আটকায় না; আর ঐতিহাসিক ব্যাপারে ভাবের ধারাই প্রধানত দ্রষ্টব্য, কাল কিছুই নয়।

রামচন্দ্র যে কেবল কৃষিকার্য্যে সুনিপুণ ছিলেন, এরূপ নহে। তিনি আবার ধর্ম্ম প্রচারকও ছিলেন। ঠিক এখনকার মিসনারিদের মতন। সে ধর্ম্মও আবার যে সে ধর্ম্ম

নহে, খাঁটি "একেশ্বরবাদ" অর্থাৎ আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম। তবে স্থানে স্থানে দেখি, বাল্মীকি তাহার সম্বন্ধে বড় ভুল করিয়াছেন। বাল্মীকি বলেন, রাম বনে যাইবার সময়ে সীতাকে গৃহে থাকিয়া ব্রত উপবাস ও দেবতাদিগের পূজা করিতে উপদেশ দিতেছেন—

"ব্রতোপবাসপরয়া ভবিতব্যং ত্বয়া নঘে।
কল্য মুখ্যায় দেবানাং কৃত্বা পূজাং যথাবিধি॥

আবার রাম নিজেও বনে যাইয়া দেবতাদিগের পূজা করিবেন, এ কথাও বলিতেছেন :—

"দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ কর্ত্তব্যং বিধিপূর্ব্বকম্।"

রামকে কোন সময়ে নারায়ণের ধ্যান করিতে দেখি, কখনও বা শিবের পূজা করিতে দেখি, আবার কখনও বা আদিত্যের স্তব করিতে দেখি। বলা বাহুল্য, ইহা আধুনিক একেশ্বরবাদীর উপাসনা নহে। সুতরাং সীতার বনবাস গল্পের ন্যায় এগুলি যে পরবর্ত্তী কালের আচারপন্থী ব্রাহ্মণদের প্রক্ষিপ্ত-বচন (interpolation), সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কবির শিবকে লইয়া মহা বিপদে পড়িয়াছেন। এতদিন সাহেব ঐতিহাসিকগণের মুখে শুনিতাম, রুদ্র হইতেছেন,"অনার্য্য-দেব দেবতা, কারণ তাঁহার মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, যাহা তাঁহার নামেই প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, না, সে কথা ঠিক নয়। এ রুদ্র হইতেছেন বৈদিক দেবতা, আর শিব অনার্য্যদের দেবতা —স্বয়ং অনার্য্য। এই যে দক্ষযজ্ঞের কথা শুনিয়াছ, তাহাও আর্য্য অনার্য্যদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদের ইতিহাস। "বৈদিক যজ্ঞে অনার্য্য শিবকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, সেই উপলক্ষে (আর্ষ প্রয়োগ!) শিবের অনার্য্য অনুচরগণ যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিল।" আর প্রজাপতি দক্ষ জানিয়া শুনিয়া স্বীয় দুহিতা সতীকে যখন শিবের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন,তখন শিব ছিলেন আর্য্য! যাহা হউক, আর্য্য-সুতা দাক্ষায়ণীকে বিবাহ করিয়াও অনার্য্য শিব আর্য্য হইতে পারেন নাই। মহাভারতের যুগেও দেখা যায়, তিনি সেই অনার্য্যই আছেন। "কৃষ্ণের অনুবর্ত্তী অর্জ্জুন কিরাতদের দেবতা শিবের কাছে একদিন হার মানিয়াছিলেন।" কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে ধূর্ত্ত শৈবগণ যখন বৈদিক দেবতা রুদ্রের সহিত শিবের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিল, তখনই আর্য্য অনার্য্যের বিরোধ মিটিয়া গেল। এ বিষয়ে কবির উক্তি এই "অবশেষে শিবকে বৈদিক রুদ্রের সহিত মিলাইয়া একদিন তাঁহাকে আপন করিয়া লইয়া আর্য্য অনার্য্যের এই ধর্ম্ম বিরোধ মিটাইতে হইয়াছিল।" অর্থাৎ তখন শিব জাতিতে উঠিলেন।

কবি এখানে অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভারতেতিহাসের মধ্যে এক নূতন আলোক বিকীর্ণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের মনে সেই আলোকের মধ্যেও যেন একটু ধোঁয়া ধোঁয়া লাগে। পুরাণ ও মহাভারতের বহু পূর্ব্বে রচিত বৈদিক শাস্ত্রে আমরা এক দেবতাকেই শিব ও রুদ্র নামে অভিহিত হইতে দেখি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে :—

"যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

যাতে রুদ্র শিবাতনূরঘোরা পাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়াগিরিশন্তাভিচাকশীহি॥
যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মাহিংসীঃ পুরুষং জগৎ॥

* * * *

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
ঈশং তং জ্ঞাত্বা অমৃতা ভবন্তি॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যু মেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

* * * *

সর্ব্বাননঃ শিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূত গুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্ব গতঃ শিবঃ॥
মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তি মীশানোজ্যোতিরব্যয়ঃ॥
ঘৃতাৎ পরং মন্তমিবাতিসূক্ষ্মম্
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষ্ গূঢ়ং।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।

* * * *

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখাংতেন মাং পাহি নিত্যং॥"

উদ্ধৃত মন্ত্রগুলির অনুবাদ অনাবশ্যক। আমরা এগুলিতে মহাদেবে "রুদ্র" "গিরিশ" "ঈশ", "ঈশান" "শিব" এই সবগুলি প্রচলিত নামই পাইতেছি। আর দেখিতেছি, বৈদিক ঋষিগণই সেই বিশ্বনাথের ভগবান্‌কে এই সকল নামে পূজা করিতেন। শিব অনার্য্যের দেবতা ও অনার্য্য হইলে তাঁহাকে ঋষিগণ পূজা করিবেন কেন? এই মন্ত্রগুলি আর্য্য অনার্য্যের বিরোধ নিষ্পত্তির পরে রচিত হইয়াছিল, তাঁহার প্রমাণ কোথায়? এবং একথা বলাই সঙ্গত যে, আর্য্যগণের শিব রুদ্র প্রভৃতি নামধারী দেবতাকে অনার্য্যগণ ও তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও অধিকার অনুরূপ ভাবে পূজা করিতে আরম্ভ করিল।' এরূপ বলিলে ইতিহাসের ধারা বরং যুক্তিসঙ্গত ভাবে রক্ষিত হয়, কোন উদ্ভট কবিকল্পনার প্রয়োজন হয় না।

এই বৈদিক দেবতা প্রসঙ্গে কবিবরের আরও একটী কথার বিচার করা যা'ক। তিনি বলেন, "প্রাচীন বৈদিক মন্ত্র তন্ত্র ক্রিয়া-কলাপের দেবতা ব্রহ্মা এবং নব্যদলের দেবতা বিষ্ণু। এই নব্যদলের অর্থ অবশ্য আধুনিক নব্যদল নহে, পৌরাণিক নব্যদল, অর্থাৎ রামচন্দ্র প্রভৃতি। কিন্তু রামচন্দ্র নব্যদলের লোক হইলেও, তিনি যে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র আদিত্য প্রভৃতি সকল দেবতাকেই পূজা করিতেন এবং তিনি যে একজন ঘোর "পৌত্তলিক" ছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে আর বেশী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম না। আসল কথা এই, কি নব্যদল, কি প্রাচীন দল, সকলেই একমাত্র পরমেশ্বর বা ভগবান্‌কে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নামে উপাসনা করিতেন, এবং হিন্দু উপাসকগণ এখনও করিয়া থাকেন। তবে আধুনিক নব্যদলের কথা স্বতন্ত্র।

প্রবন্ধ ক্রমে দীর্ঘ হইয়া পড়িল। এখন মহাভারত সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া উপসংহার করিব। লেখক বলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের গোড়ায়ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সামাজিক বিবাদ। "তাহার একদিকে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ, অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষ।" "এই বিপ্লবের অবসানে বৈষ্ণব ধর্ম্মকে ব্রাহ্মণেরা আপন করিয়া লইয়াছেন।" ভক্তির বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশেষ ভাবে ক্ষত্রিয়ের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম।

মূল মহাভারত হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া এই সকল অসার উক্তির খণ্ডন করিতে গেলে,

পুঁথি অনেক বাড়িয়া যাইবে। সেইজন্য সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের গোড়ায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সামাজিক বিবাদ, ইহা আর একটা কাল্পনিক কথা। আমরা মহাভারতে পাই, কুরু ও পাণ্ডবদিগের গৃহবিবাদ হইতেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উৎপত্তি। দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে পাঁচখানি গ্রাম দিলেও এই যুদ্ধ ঘটিত না। শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া দলাদলি হইয়াছিল, ইহাও সম্পূর্ণ নূতন কথা। সকলেই জানেন, কুরু-পাণ্ডবদিগের এই গৃহবিবাদে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নির্লিপ্ত (neutral) থাকিয়া ইহা মিটাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে যখন কিছুতেই সে জ্ঞাতিবিরোধ মিটিল না, তখন তিনি উভয়-পক্ষকেই সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি একদিকে তাঁহার নারায়ণী-সেনা ও অন্যদিকে নিজকে রাখিয়া প্রথমতঃ দুর্য্যোধনকেই ইহার যে কোনটা বাছিয়া লইতে বলিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে না লইয়া নারায়ণী-সেনাই গ্রহণ করিলেন, তখন বাধ্য হইয়া কৃষ্ণকে পাণ্ডবপক্ষে যাইতে হইল। তবে অবশ্য তাঁহার মনের টান পাণ্ডবপক্ষেই পূর্ব্ব হইতে ছিল, কারণ যেদিকে ধর্ম্ম, ধর্ম্মরক্ষক শ্রীকৃষ্ণও সেই দিকে থাকিবেন, তাহা বিচিত্র কি?

শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আর তিনি গীতা দ্বারা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেইজন্য ভক্তিধর্ম্মকে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কিরূপে বলা যায়? গীতায় যে ধর্ম্ম-প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কোন নূতন ধর্ম্ম নহে, তাহা উপনিষদেরই ধর্ম্ম।

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উপনিষদরূপ ধেনু হইতে গীতারূপ দুগ্ধামৃত দোহন করিয়াছেন মাত্র। উপনিষদ্ ব্রাহ্মণের প্রবর্ত্তিত হইলে ভক্তিধর্ম্মও ব্রাহ্মণের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম। বিশেষতঃ দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই ভক্তি-ধর্ম্মকে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণের সাহায্যে বিশেষরূপে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে মহর্ষি নারদ এবং শাণ্ডিল্যও এই ভক্তি-ধর্ম্মকে সূত্রবদ্ধ করিয়াছিলেন।

ব্যাসদেবের বেদ-বিভাগ, ব্রহ্মসূত্র রচনা ও পুরাণ-প্রণয়ন কোন্ সময়ের ঘটনা? এসম্বন্ধেও কবিবরকে তাঁহার উদ্দাম-কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। তিনি বলেন—

"তাহার পরে (বৌদ্ধযুগের পরে) সামাজিক প্রলয়-ঝড়ে আপনার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলিকে খুঁজিয়া লইয়া জোড়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই চেষ্টার ফলে ব্যাস বেদসংগ্রহ করিলেন।"

অর্থাৎ কবিবরের মতে বেদব্যাসের বেদসংগ্রহ ও মহাভারতাদি রচনা বৌদ্ধ-যুগের পরবর্ত্তী ঘটনা।

ইহার পরেই আবার বলিতেছেন—"ইহা কাল্পত-যুগ নহে, ভারত যুগ।" নিছক কবি-কল্পনা বলিলেই সব গোল চুকিয়া যাইত।

"বৌদ্ধ-যুগের যথার্থ আরম্ভ কবে, তাহা সুস্পষ্টরূপে বলা অসম্ভব। শাক্য সিংহের বহুপূর্ব্বে তাহার আয়োজন চলিতেছিল এবং তাঁহার পূর্ব্বেও যে অন্য বুদ্ধ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।" তবে আবার রামায়ণের দুই এক স্থানে বৌদ্ধের উল্লেখ আছে বলিয়া রামায়ণকে বৌদ্ধযুগের পরে টানিয়া আনা হয় কেন? শাক্য সিংহের পূর্ব্বেও অন্যান্য বুদ্ধ ছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সকল বুদ্ধের দ্বারা সামাজিক-বিপ্লব হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কি? অন্ততঃ প্রচলিত ইতিহাসে তাহা বলে না।

আমরা দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে একটা বিষয় প্রমাণ করিতে বহুল আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। সেটী হইতেছে, ব্রহ্মবিদ্যা ও ভক্তি-ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠতা। কিন্তু এজন্য তাঁহার এত কষ্ট স্বীকাব কেন? আমরা দেখিতে পাই, কিছুদিন যাবৎ তিনি আচাবপন্থী হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে একটা regular campaign (যুদ্ধ-যাত্রা) আবম্ভ কবিয়াছেন। হয়ত তাঁহাব বিশ্বাস, আচাবেব মূলোচ্ছেদ করিতে পাবিলে সকলেই ব্রহ্ম-বিদ্যালাভের অধিকাবী হইবে এবং জাতিবিচার উঠিয়া গেলে ভারত উদ্ধাব কবিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। ব্রাহ্মণ-গণই স্মৃতিশাস্ত্রেব পাঁজি-পুঁথী লইযা আচাব-ধর্ম্ম-বক্ষণে তৎপব। যদি দেখান যায়, ব্রহ্ম-বিদ্যা ও ভক্তিধর্ম্মেব বিকাশ প্রথমতঃ এই সকল আচাব-ভক্ত ব্রাহ্মণদিগেব মধ্যে না হইয়া ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে হইযাছিল, তবেই আচাবপন্থীদিগেব বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা ডিক্রি হইল। আমবা দেখিযাছি, তাঁহার এইরূপ অদ্ভুত-সিদ্ধান্ত সকল প্রমাণ কবিতে গিযা, তাঁহাব কল্পনাব ঘুড়ি বাস্তবঘটনার পার্থিব রাজ্য ছাড়িয়া বহু উর্দ্ধে বিচবণ কবিযাছে, তাঁহাব খেয়ালরূপ জগন্নাথেব রথ কত শত প্রকৃত তথ্য পদদলিত করিয়া প্রবলবেগ ছুটিয়াছে।

কিন্তু তিনি যাহাই বলুন, একথা তাঁহাব স্মরণ রাখা উচিত, তিনি একজন খ্রীষ্টান মিশনারি নহেন, একজন উকীল বা এডভোকেটও নহেন—তিনি বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। সকলেই তাঁহার নিকট প্রত্যেক বিষয়ে নিরপেক্ষ ন্যায-বিচার আশা কবিয়া থাকে। বিশেষতঃ একশ্রেণীব নব্য-যুবকের নিকট তিনি একজন demi god বা অবতার বলিয়া পূজিত। ইহাঁদেব মধ্যে অনেকে আবার কৃষ্ণগত-চিত্ত ব্রজগোপিকা-গণের ন্যায় নিজ নিজ ধর্ম্ম-কর্ম্ম, চিন্তাশক্তি, চিত্তেব স্বাধীনতা তাঁহাকে অর্পণ কবিযাছেন। কেহ কেহ বা তাঁহাব বচনাভঙ্গী, হবফেব টান, চোখেব চাহনি, চুলেব ফ্যাসন পর্য্যন্ত অতি যত্ন পূর্ব্বক নকল কবিতে চেষ্টা কবেন। এরূপ স্থলে, তাঁহাব কোন ঝোঁকেব বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল তবলমতি যুবককে বিপথে চালিত কবা উচিত নহে। আব এই প্রবন্ধে তিনি ইতিহাস বচনাব যে পদ্ধতি দেখাইয়াছেন, এই শ্রেণীব যুবকগণেব নিকট যদি তাহা প্রকৃত পদ্ধতি বলিযা অনুকৃত হয়, যদি ঐতিহাসিক-গবেষণায accuracy (যথাতথ্য) অপেক্ষা imaginationএব (কল্পনার) আদব বেশী হয, তবে বঙ্গ-সাহিত্যেব পক্ষে বড়ই দুর্দ্দিন বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। দীন-বঙ্গ-সাহিত্যকে এই দুর্দ্দিনে কে বক্ষা কবিবে?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

স্বাভাবিক যোগ।

প্রাণী ও প্রাণ—স্বাভাবিক জ্ঞান, আপনা হইতেই পরিস্ফুট হয়। মাতৃ-গর্ভ হইতে শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, তৎ পরক্ষণে স্বভাবতই মাতাব স্তন্যদুগ্ধ টানিয়া লয়। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উঠে, পড়ে, চলিতে শিখে কাব শিক্ষা বলে? ঐ স্বাভাবিক জ্ঞান প্রভাবে। প্রাণী মাত্রেরই প্রাণা-

ধারে একই মনোবৃত্ত প্রজ্ঞা বিদ্যমান রহিয়াছে। উহারই সাধন সংসাধনে "স্বাভাবিক-যোগ" বিকাশ পায়। এই নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল যোগ পূর্ণ চিৎশক্তি হইতে প্রকাশ পাইয়া সবল যোগের বিশুদ্ধ পন্থা প্রদর্শন করে। ইহার আশ্রয়েই ভারতে রাজযোগের তত্ত্ব সমূহ যোগিগণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু সময়-বিবর্ত্তনে মানবের রুচিভেদে জগত্তত্ত্বের পরিবেষ্টনেও স্বাভাবিক যোগের ব্যত্যয় হয় নাই। বস্তুতই একটুক বুঝিতে হইলে সকল প্রকার যোগের অঙ্গ-প্রবিষ্ট শোণিত প্রবাহরূপে ঐ স্বাভাবিক যোগতত্ত্বের সময়োচিত স্তিমিত-গতি হইয়াও বল প্রদান করিতেছে। রাজ-যোগ প্রক্রিয়া সাধন-সম্পৃক্ত হইলেও অতি আদরের বস্তু। প্রাচ্যকালের যোগিগণ এই রাজযোগের অনুসরণে কত যে জগতের হিত-সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা মনে করিলে প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়। দুঃখের কথা এই যে, তদনুরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তনে ধর্ম্ম ও জগৎ, উভয়ই,অভিনব স্তরে পর্য্যবসিত, সুতরাং যুগ অথবা কাল প্রভাবে প্রাচ্যস্তরটী উপশমিত হওয়াতে উপযুক্ত মহাযোগের ধারণা কল্পে বিঘ্ন সংঘটিত হইতেছে। বলিতে কি, প্রতীচ্যস্তরে অবস্থিতি করিয়া মানবের পরমায়ু সংখ্যা ও সাত্ত্বিক বুদ্ধি ক্রমেই হ্রাস হইতেছে এবং ঐশ্বর্য্য-স্পৃহা বলবতী সত্ত্বে হৃদয়ের ধর্ম্মস্তরও যুগপৎ বিলুপ্ত প্রায় দেখা যায়। ফলতঃ এখনও সেই যোগ-স্পৃহা ভারতবাসীর হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় নাই। কিন্তু কালের নিষ্পেষণে ও প্রতীচ্যভাবের সংঘর্ষণে যোগ-সাধন ত দূরের কথা, ধর্ম্ম চিন্তাটীও যেন আকাশ-গর্ভে বিলুপ্ত। আমরা কি বলিতে পারি যে, সেই প্রাচ্য যোগিগণের পদাঙ্ক স্মরণ করিয়া ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্যকে প্রাণে ধারণা করিব এবং একটী মুহূর্ত্তের জন্য বিশুদ্ধ তত্ত্বাতীত চিন্তায় সময় দিতে সমর্থ হইব? কখনই নহে। পাশ্চাত্য নৈতিক শক্তির প্রখর উত্তেজনায় ভারত-বক্ষ নিরবচ্ছিন্ন সন্তপ্ত—এতনিবন্ধন প্রাচ্য কালের ধর্ম্মস্তরও বিনিষ্ট হইয়া যাইতেছে। হায়! যে ভার-তের ঋষিপুঙ্গবগণ একমাত্র যোগবিজ্ঞানের পরকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন এবং মনোবিজ্ঞান বলে দূর দূরান্তরে নির্জ্জন-গিরি গহ্বরে অবস্থিতি করিয়াও পরস্পর চক্ষুর উন্মেষিত কালমধ্যে সাধন সম্বন্ধ গ্রহণ করিতেন ও দিতেন, এখন তাঁহাদেরই বংশধরগণ কি ভয়ানক দুরবস্থায় অবস্থিত। তবে কি আমরা নিরাশার ক্রোড়েই সুখে নিদ্রা যাইব—না, একি কখনও সম্ভব? ঐ যে প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়-আকাশে আশার উজ্জ্বল জ্যোতি স্বাভাবিক জ্ঞান প্রত্যক্ষ, উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াইত আমরা নিরা-শার অতলতলে প্রবেশ করিতেছি।

স্বাভাবিক জ্ঞান প্রাচ্যেও ছিল, প্রতীচ্যেও আছে এবং অনন্তকাল থাকিবে। ইহার স্ফূরণ সকল প্রকার প্রাণীর অন্তরভেদ করিয়া রহিয়াছে। প্রাণি-জগতে আমরা যত প্রকার প্রাণী দেখিতেছি, বস্তুতই একই জ্ঞান-তরঙ্গের দ্বারা প্রত্যেক শরীর যন্ত্রের নিয়মানুসারে কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। গূঢ় চিন্তাপ্রদেশে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, যেমন বিবিধ বর্ণের কাচফলকে এক সূর্য্যকে নানা বর্ণে দৃষ্ট হয়, তেমনই,ঐ জ্ঞান-প্রবাহ পশুপক্ষ্যাদি ও মানব-গণের শরীর বিশেষে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ইহাকে জ্ঞানের বৈচিত্র্য তরঙ্গ বলে। এই জন্য সিদ্ধযোগীরা প্রাণীমাত্রকেই হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে গ্রহণ করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করেন। জ্ঞান-প্রবাহ দেহরূপ আধার বিশেষে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হইলেও ঐ স্বাভাবিক জ্ঞানপ্রসূত শক্তিকে অবলম্বন করত

প্রাণী সকল স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিশ্বসৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে। এখানে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, মানবের জ্ঞান কোন অংশে উন্নত, পশুপক্ষ্যাদির জ্ঞানও কোন অংশে শ্রেষ্ঠ। স্থপতিগণ জ্ঞান প্রভাবে নেত্র-মুগ্ধ রমণীয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছে, আবার ঐ বাবুই পক্ষীটী কেমন সুন্দর কুলায় প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহাতে বাস করিয়া থাকে। এখানে স্বাভাবিক জ্ঞান উভয়েরই তুল্য। আরও দেখুন, হস্তীটী প্রকাণ্ড বৃক্ষটীকে সমূলে উৎপাটিত করিল, ঐ পতঙ্গটী হেলিয়া দুলিয়া আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিল। এরূপ স্থলে একটুকু ভাবিয়া দেখিলে জানা যায়—হস্তীটী উড়িতে পারে না, ফড়িংটী বৃহৎ বৃক্ষটী ভাঙ্গিতে সক্ষম নহে। তবেই বুঝুন, পতঙ্গ মাতঙ্গে শক্তির তুল্য তরঙ্গ। সুতরাং জ্ঞানশক্তি, নীতি ও কার্য্য প্রণালী দেহোপযুক্ত অব্যর্থভাবে চলিতেছে। কেহ কাহারও প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব অভিমানের দাবী করিতে পারে না।

একই চিত্তের পূর্ণ সত্তা হইতে বিশ্ব-বিধানের বিচিত্র চিত্র, ভিন্ন ভিন্ন শরীরোপযোগী কর্ম্মা-ভাব ব্যক্ত হইতেছে। এমন কি, একটী সরীসৃপ পর্য্যন্ত অনাদি মহাশক্তির ব্যবধানে থাকে না। কোটী কোটী জগৎ সেই অনাদি অনন্ত-শক্তিতে বিজড়িত। এই নিরপেক্ষ উদার জ্ঞান অন্তঃকরণে প্রদীপ্ত হইলে, অভেদ তত্ত্বের মাহাত্ম্য স্বভাবত হৃদয়ঙ্গম হইয়া পড়ে।

নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, সচেতন জন্তু মাত্রই প্রাণী-সংজ্ঞায় এক শক্তিতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। উহাদের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য ভাব দেখিয়া এটী ভাল, এটী মন্দ, ইহা নির্ব্বাচন করিতে গিয়া আমরা ঘন কুজ্ঝটিকার ভিতরে ডুবিয়া যাই, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করি না। ভাবিয়া দেখি না যে, জাগতিক জন্তু-বৈচিত্র্যভাবের কারণ কি? বুঝিতে হইবে যে, একই জ্ঞান-প্রবাহ প্রভাবে ঐ ভীষণ মূর্ত্তি ব্যাঘ্রটী কৃষকটীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্তপাত করিল। বিস্তৃত ফণাবিশিষ্ট সর্পটী ঐ কনক কান্তি যুবককে হঠাৎ দংশন করিয়া গেল। আবার ভয়ঙ্কর ভূকম্পনে সহস্র সহস্র নরনারী একসঙ্গে মৃত্যু মুখে পতিত হইল। কিন্তু ধীর এবং স্থীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ঈদৃশ বিনাশ বিপর্য্যয় ভাবেও কেহ কাহারও শত্রু নহে; সকলেই একসূত্রে নিবদ্ধ। একই মহা শক্তির অব্যর্থ ঘটনার মূলে দেহ-লীলার অবসান হইয়া থাকে। অথচ আমরা দেখিলাম, ঐ শ্বাপদ, সর্প, ও ভূকম্পনাদি কি ভয়ঙ্কর শত্রু। বাস্তবিক উহারা শত্রু নহে, বন্ধু। দেহ-পাতের ব্যবস্থাও বিশ্ব-বৈচিত্র্যের অঙ্গীভূত। অনন্ত কাল একই নিয়মের অধীনে চলিতেছে। প্রাণিগণের শরীর-পাত হইলেও প্রাণ * বিনষ্ট বা ধ্বংস হয় না।

শরীরের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও প্রাণ খণ্ড নহে। উহা মহাপ্রাণের প্রবাহ মাত্র। আমরা জড়-বিজ্ঞানের প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া মহা বিজ্ঞান-শক্তির বিকাশ, প্রাণকে সকলপ্রকার দেহ-ভাবে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করি, কিন্তু উহা স্থূলের ভুল-তরঙ্গ। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি প্রাণের অখণ্ড স্বরূপ হইল, তবে শ্বাপদ-সর্পাদির হিংসাভাব, মনুষ্যের সাধুভাব দেখা যায় কেন? উত্তরে অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, একই মৃত্তিকার রসে ইক্ষুতে মিষ্ট ও নিম্বফলে তিক্ত অনুভব হয়। ইহার তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইলে, প্রমাণিত হইবে

* ইহা হৃদয়স্থিত বায়ু নহে, চিচ্ছক্তি-জড়িত অনন্ত নিরাকার জীব।

যে, ঐ ইক্ষু এবং নিম্ব বৃক্ষের পরমাণু অবস্থা-ভেদে রসের ভিন্নতা জন্মিয়া থাকে, উহাই দৈহিকভাবের ভিতরে চিৎতরঙ্গ। আমরা জন্তু সকলের আভ্যন্তরিক প্রাণের গতিকে খণ্ড বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছি বটে, কিন্তু একই প্রাণপ্রবাহ পশুতে মানবে তুল্য-প্রবাহিত হইতেছে। জগচ্চিত্রে ইহাও দেখা যায় যে, মনুষ্যও কু-প্রবৃত্তির শাসনে পড়িয়া পশু-চরিত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কতই না ঘৃণিত কার্য্য করিতেছে। কোন দেশ-ভ্রমণকারী পথিকের নিকট ইহাও শুনিয়াছি, বানরেও সাধুভাবের আশ্রমে বনফলদ্বারা অতিথি-সৎকার করিয়া থাকে। ইহাতে কি আমরা বুঝিব না যে, "সমপ্রাণতাই" স্বাভাবিক যোগের সরলপথ। কিন্তু ভাবতে বিবিধ প্রকারের বিঘ্ন বিড়ম্বনা-জনিত কারণে যখন পরস্পর মিলন অসম্ভব, তখন একপ্রাণতার অমৃত আস্বাদনের আশা কি সুদূরপরাহত নহে? সুতরাং ধর্ম্ম, সত্য ও নৈতিক-বল ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ঈদৃশ শোচনীয় সময়ে সমপ্রাণতার ঐক্যবন্ধন নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, স্থূল-জগতের অতীত এমন একটী স্থান আছে যে, সেই স্থান হইতে একটী অনুপমেয় জ্যোতিঃ-প্রবাহ (প্রাণ) অর্থাৎ জৈবিকতরঙ্গ প্রাণী-সমূহের অন্তর্ভেদ করিয়া অনন্তকাল ছুটিতেছে। বস্তুতঃ ঐ জৈবিকভাবের অখণ্ড-প্রবাহের মূল-কেন্দ্র অসীম শক্তি-মণ্ডলময় পূর্ণ চৈতন্য 'আত্মা' —দেশকালের অতীত অনাদি নিত্য। তিনি প্রকৃতির আকারে অস্পর্শ শক্তি-প্রভাবে বিশ্ব-লীলার কারণীভূত হইয়া আছেন। স্থূলের আবরণ প্রত্যক্ষ থাকিয়াও অপ্রত্যক্ষ। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, মানুষ প্রাণশক্তিকে ভেদসঙ্কুল বিবিধরূপে বুঝিয়া থাকে। অথচ একপ্রাণতাই যে সেই অসীম শক্তি-মণ্ডলে গমনের একমাত্র সহায়, তাহা উপেক্ষা দ্বারা প্রভেদ চিন্তা-প্রসূত অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তন্নিমিত্ত স্বাভাবিক সাধন-চিন্তা পরিস্ফুট হয় না।

আহা! এমন যে আত্মার অখণ্ড কিরণ-তরঙ্গ প্রাণ, আমরা তাহারই একত্ব সাধন সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকি। সেই অমৃত-প্রবাহ স্বরূপ প্রাণের সাধন—অভেদ ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত সম্ভবে না। ঐ অপ্রভেদ ভক্তিই প্রত্যেক প্রাণীর শরীরস্থিত প্রাণকে সমভাবে এক করিয়া দেয়। অভেদ ভক্তির কার্য্যই এই যে, সে ঐ বৃক্ষটীর মূলেও নত এবং কালকুট-দংষ্ট্র ভীষণ মূর্ত্তি ভুজঙ্গের নিকটেও তুল্যভাবে অবনত—মানবের ত কোন কথাই নাই। তবেই দেখা যাইতেছে, অভেদ ভক্তির সাহায্যে সাধনে সক্ষম হইলে "সমপ্রাণতা" আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাণীতে একই প্রাণের প্রকাশ প্রত্যক্ষ হইবে। ইহাই প্রক্রিয়া-বিহীন প্রকৃত "প্রাণায়াম"। যোগিগণ এই সাম্যতত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহারা শরীরের প্রভেদ সত্ত্বেও প্রাণ-তত্ত্বের ভেদ-ভাব মনে করেন না। নির্জ্জন নিবিড় অরণ্যেও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণকে লইয়া যেন একটী পরিবার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন প্রেমে পরমানন্দে যোগ সাধন করেন। হায়! বস্তুতঃই আমরা ভ্রান্তির ছায়ায় পশু পক্ষীদিগকে নীচ বলিয়া মনে করি। উহাদের সুখের বাস গৃহ অরণ্য, তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া লৌহ-পিঞ্জরে কতই যে কঠোর যন্ত্রণা দেই, উহা বদ্ধ ভাবে থাকিলেই জানা যায়। কিন্তু উহাদের স্বাধীন ইচ্ছাটুকু যে একবারে ঘুচাইয়া দিয়া ঘোরতর নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছি, তাহা বুঝিতে

সময় পাই না। আহা। সম্মুখে উপর্য্যুক্ত যোগিদিগের সমপ্রাণতার বিশুদ্ধ আদর্শ রাখিয়া আমরা প্রাণ-যোগের গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারি না কেন? কেনই বা প্রাণী-নির্য্যাতনের উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়া যাই? একটু উদারতার সহিত ভাবিয়া দেখিলে ইহার মর্ম্মস্থিত তত্ত্ব অনায়াসে প্রত্যক্ষীভূত হইবে। বিষয়-বাসনাই ভেদ বুদ্ধির পরিচায়ক, উহা দ্বারা প্রাণ-যোগের সম্পূর্ণ অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে। বহুশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতই হউন, অট্টালিকাবাসী ধনীই হউন, আর জটা-ভস্ম-ভূষিত সন্ন্যাসীই হউন, সকলেই ঐ বাসনার রসে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তখনই সম্মান-সুখাভিলাষী মোহ বীর-দর্পে চাপিয়া ধরিবে, কিছুতেই তাহার হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় থাকে না। তাহার ভীষণ শাসনে পণ্ডিত শ্রেষ্ঠত্ব-সম্মান প্রত্যাশী হইয়া বিচারে সভাজয়ী হইতে উন্মত্ত—ধনী অন্তত একটী টাকাও কোষাগারে ফেলিবার জন্য ব্যস্ত,—ঐ সন্ন্যাসীটী এক ছিলুম গাঁজার নিমিত্ত যোগ ভঙ্গ করিয়া পরাধীন। ইহাতে কেমন করিয়া বলিতে পারা যায় যে,বাসনাকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রাণের একত্ব সাধনে আগ্রহ জন্মিবে?

আমরা স্থূল জগতের সূক্ষ্ম পরমাণুরও সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত করিতে প্রস্তুত! কিন্তু প্রাণ-তরঙ্গের ঐক্য বন্ধনে এতই উদাসীন যে, যদ্দ্বারা অনন্ত শক্তিময় আত্মার জ্যোতিঃ স্পর্শ করিবার পথ প্রসারিত হয়, সেই প্রভা-বিকাশ ছটা, সকল প্রকার শরীরাধারে দেখিয়াও বিস্মৃত থাকি, কি দুঃখের কথা! প্রাণিজগতে প্রবেশ করিলে আমরা কি দেখিব না যে, কোটি কোটি জগচ্চক্রের মধ্য দিয়া এক প্রাণ-সূত্র আত্মার অসীম সত্তার সহিত নিবদ্ধ রহিয়াছে। হায়! সেই প্রাণ-সূত্রকে স্থূলের বিবিধ আবরণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধরিয়া শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টতার পরিচয় দেখাইতেছি। এই ভেদ-বিপজ্জালে জড়িত হইলে যে ধর্ম্ম সাধন ও যোগ চিন্তা সকলই বৃথা হইয়া যায়, তাহা আমরা চক্ষুর নিমেষ কালের জন্যও স্মরণ করিনা। বরং মোহ-তিমির ময় নরক-হ্রদের ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক নিয়ত কাল আশা-তরঙ্গের আবর্ত্তে পড়িয়া ঐশ্বর্য্য-লিপ্সার বল বৃদ্ধি করিতে ত্রুটি করিতেছি না। কুচিন্তা-প্রসূত ভেদ বুদ্ধি কেনই বা নিজের পরাক্রম প্রবল করিতে চেষ্টা করিবে না? সুতরাং প্রাণের 'একত্ব' দর্শনের বিশুদ্ধ পন্থা বিস্মৃত হইয়া আসক্তির স্নিগ্ধ ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছি। কেমন করিয়া বলিব যে, স্বাভাবিক জ্ঞান বলে জগচ্চিত্রের মধ্যে প্রবেশ করতঃ নির্লিপ্ত ভাবে সমপ্রাণ-প্রাণায়ম সাধনে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইব? বস্তুতই আমরা কিছুই করি না, অথচ গৌণকাল-লব্ধ প্রক্রিয়া সাধন-প্রয়াসী হইয়া পরিশেষে উভয় দিকেই বঞ্চিত হইতেছি এবং প্রাণশূন্য চিন্তার জটিল প্রদেশে ভ্রমণ করিতে থাকি, তথাপি সহজ সাধনের ভিত্তি সমপ্রাণতার বিশুদ্ধ ভাবটীকে হৃদয়ে পোষণ করিবার ইচ্ছা করি না। এটি আলস্যের তাড়না বা বিষয়াশক্তির প্রলোভন ভিন্ন আর কি বুঝিব?

এখানে একপ্রাণতা সম্বন্ধে একটী কথা মনে পড়িল। আমার একজন বন্ধু একবার কুম্ভযোগে প্রয়াগ-তীর্থ দর্শনে যান। গঙ্গা-যমুনা ও অদৃশ্য পূত-তরঙ্গিণী-সরস্বতী, এই ত্রিবেণী তীর্থ ক্ষেত্রের নানা স্থানে সাধু দর্শন করিয়া বড় প্রীতি পাইয়াছিলেন। পরিশেষে আর একটী স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, একজন মহা তেজস্বী সন্ন্যাসী একখানি কম্বলাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার

অনতিদূরে একটী কনষ্টবল এক ব্যক্তিকে কোন অপরাধে বেত্রাঘাত করিতেছে। সেই তীব্র আঘাতে অপরাধীর ভ্রূক্ষেপ নাই, সে নীরব, কিন্তু সন্ন্যাসী ঐ প্রত্যেক বেত্রাঘাতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়-ভেদী ক্রন্দন শুনিয়া দেখিতে দেখিতে অনেক লোক জুটিয়া গেল। বহু লোকের সমাগমেও সন্ন্যাসীর রোদন নিবৃত্ত হইল না। ঐ সময় একজন পশ্চিম বিহার-বাসী দর্শক ঐ তেজপুঞ্জ যোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপ্ রোতে হ্যাঁয় কেঁউ। সন্ন্যাসী নেত্র-নীরে আপ্লুত হইয়া অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিলেন, "ঐ সিপাহী হামকো বহুত জোরসে মারতা হ্যায়।" ইহা শুনিয়া অপর এক ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, "সাপকাটে উধকো মাধকো লাগে বিষ— বাবা তাজ্জব।" কিন্তু আমার বন্ধু বিস্ময় ও অবাক্ হইয়া সন্ন্যাসীর তেজময় সাম্যমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যতই তাঁহাকে দর্শন করেন, ততই মহদ্ভাবের বিকাশ দেখিতে পান। বন্ধুটী সেই তেজপুঞ্জ সন্ন্যাসীর অসামান্য যোগ-জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধরাবনত প্রণাম করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যোগিদিগের আপন-পর ভেদভাব কিছু থাকে না। তাঁহারা স্বাতন্ত্র্য শরীরে অবস্থিতি সত্ত্বেও একপ্রাণ হইয়া যান। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া অন্যান্য দর্শকগণের সন্দেহ ভাব অনেকটা উপশমিত করিলেন। এই ঘটনার ভিতরে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, জান্তব জগতে সকলের প্রতি যোগিদিগেরও যতক্ষণ প্রাণে অভেদ ভালবাসা না জন্মে, ততক্ষণ তাঁহারাও যোগ-রাজ্যে উপস্থিত হইতে সক্ষম হন না। কারণ সাম্য-মিলনই উদারতার পরিচায়ক, উহা দ্বারাই সার্ব্বভৌমিক পবিত্র দৃষ্টি পরিস্ফুট হয়। এবং সারল্য মহদ্গুণের সহিত মধুর প্রেমের আনুগত্যে সাধন-বিরোধী ইন্দ্রিয়াদি ওদ্ধত্যপ্রবৃত্তিসমূহ বশীভূত হইয়া শুভ পথ প্রদর্শন করে। বস্তুতঃই অবিচ্ছিন্ন মধুর প্রেমের উত্তেজনায় সত্যোন্মুখিনী "রুচি"কে সঞ্জীবিত করিতে পারিলে প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়-পটে প্রাণের পৃথক্ পৃথক্ প্রতিবিম্ব ভাব সকল চলিয়া যাইবে। ঐ রুচি শক্তির নিগূঢ় ভাবের মিলনে সাধন-ব্যাঘাতা দুষ্প্রবৃত্তিগণ কুপথ-ভ্রমণ-প্রলোভনে বিরত হইবেই হইবে। তখনই শুভেন্দ্রিয় ও শুভ প্রবৃত্তি সমূহ প্রাণের বিমল তরঙ্গে নিমজ্জিত করিবে এবং জগতের সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিয়া দিবেই দিবে। কিন্তু ইহাতে সফল-প্রযত্ন না হইলে, অল্প সময়েই মোহ প্রভঞ্জনের ভীষণ ঝটিকায় প্রাণ-সমুদ্রের সম তরঙ্গ অনন্তাটী প্রাণী সমূহের স্থূল ভাবে বীচিমালার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।

এখন দেখা যাক্, রুচি-শক্তিকে কোন উপায়ে দৃঢ়রূপে ধরিতে পারা যায়। রুচির যখন শুভাশুভ উভয় ভাব মধ্যেই গমন-শক্তি আছে, তখন কুপথ-কলুষিত ভাবে সহজেইত রুচির রুচি প্রবল হইয়া থাকে, এমতস্থলে তাহার বিপথ-গতি নিরস্ত করিবার প্রকৃত মহৌষধি কি?—ইহার উত্তর এই যে, যদি একমাত্র সত্যে অনুরাগ অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে রুচি-শক্তি কখনই ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। নিশ্চয়ই অভেদ প্রাণ-যোগের মধুরভাবে আকৃষ্ট হইবে। পশু পক্ষী মানবে আত্মার অভেদ প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকিবে। তখন ছাগ-মেষাদির বধ-জনিত অনুষ্ঠানগুলি নিষ্ঠুর প্রবৃত্তির কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। এবং অনুতাপানলে হৃদয়কে কেনইবা দগ্ধ করিবে না? এই

অনুতাপ অগ্নির তীব্র-দাহনে মানুষ যখন অধীর হইয়া পড়ে, সেই সময় হৃদয়ে ঐ সত্যানুরাগ উজ্জ্বলরূপে প্রস্ফুট হইলে, তখন আপনা হইতেই রুচি, অভেদ ভালবাসার সহিত পরিচয় করিয়া দেয়। ঐ ভালবাসার সহিত যতই প্রীতিবন্ধন দৃঢ় হইবে, ততই সাধন-স্পৃহা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। কেন না, ভালবাসা রুচির প্রিয় সঙ্গিনী সখী—বস্তুতঃই উহাদের আবেগপূর্ণ আগ্রহের আতিশয্য বশতঃ সাধন-ব্যাহন্তা বিপুকুল ইসরমূল-স্পর্শ সর্পের ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া দূরে অবস্থিতি করে। তখন উপর্য্যুক্ত অনুতাপ-গ্রস্ত মানবের অবস্থা বদলাইয়া যায়। সকলপ্রকার প্রাণীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আকুল হয়। পথিমধ্যে নিরাশ্রয় রোগ-পীড়িত ভাইটীর ক্ষত অঙ্গে ঔষধি লেপন এবং সেবা-শুশ্রূষাদি করিয়াও আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না। ইহার অন্তঃপ্রবেশিনী শক্তিরূপা ঐ হৃদয়ভেদী রুচি ও অভেদ ভালবাসা। ইহাদের বিশুদ্ধ আলিঙ্গনেই প্রত্যেক শরীরের পার্থক্য-জনিত প্রাণের যে "ভেদত্ব", তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। নীচ উচ্চ, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভাব আর থাকে না, সমপ্রাণতার স্নিগ্ধ শাসনে সম্মান-অভিমানের উন্নত মস্তক অবনত হয়। এবং অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃপ্রেম জাগিয়া উঠে। এখন যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, "সত্যানুরাগ"ই যখন রুচি ও অভেদ ভালবাসার সঙ্গীভাবে মানব প্রকৃতির পবিত্রভাবের কারণ হইল, তখন প্রকৃত সত্যে নির্ম্মলানুরাগ জন্মিবার উপায় কি?—কিরূপেই বা সেই অনুরাগ, সত্য বস্তুতে নির্ভর করিতে সক্ষম হয়। বস্তুতঃই প্রাণিজগতে প্রাণি-লীলার বিবিধ কার্য্যোপযোগী বৃত্তি-সমূহ ও শুভাশুভ উভয়দিকেই চলে। অনুরাগও আসক্তিতে আকৃষ্ট হইলে বিপদ সংঘটিত করে। অথচ ঐ অনুরাগই সত্য-নিষ্ঠ হইয়া উজ্জ্বল স্বভাব গ্রহণ করিতে পারে। একটী সহজ কথাতেই বুঝুন, একজন বিবিধ ক্রীড়াসক্ত সমবয়স্ক ব্যক্তির সহিত আপনি মিলিত হইয়াছেন, তৎপ্রতি অত্যন্ত অনুরাগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ঈদৃশাবস্থায় আপনার সাধ্বী স্ত্রী—পতিভক্তির মধুর আকর্ষণে সেই ভীষণ ব্যাসন-কলুষিত অনুরাগটীকে বহুযত্নে পবিত্রতার উচ্চাসনে টানিয়া আনিলেন, সুতরাং দাম্পত্য ধর্ম্ম শৃঙ্খলে অনুরাগ বদ্ধ হইয়া সত্যের জন্য উন্মত্ত হইল। এইরূপ সাধ্বী-রমণী এবং প্রিয়তম বন্ধু দ্বারাও অনুরাগকে সরশে আনিতে পারা যায়। যে কোন ভাবেই হউক, তাহাকে সত্যে নিবদ্ধ রাখিলে, সে আর ছাড়িয়া যাইতে পারে না। সত্যপ্রিয়তাই অনুরাগের একমাত্র সম্বল। জ্ঞান, বিজ্ঞান, রসায়ন, যোগ, ধর্ম্ম, সেবা প্রভৃতি যে তত্ত্বেরই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, অনুরাগ ব্যতীত কোন তত্ত্বই সাধন করা যায় না। তবে এখানে বলিতে পারেন যে, জগতে মানবদিগের মধ্যেও দেখা যায়, কাহারও দ্বেষ, দম্ভ, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতির কার্য্য অধিক, কাহারও বা দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সাত্বিক গুণ সকল প্রবল। ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে বিজ্ঞানের একটুক চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন নহে। ভৌতিক-তত্ত্বের পরমাণুর বিশ্লেষণ প্রযুক্ত স্থূল পদার্থও পিতামাতার শোণিত-শুক্র মধ্যে মিশিয়া থাকে, উপাদানের বিভাগ-ব্যত্যয়-জনিত দৈহিকের ভাবসমূহ বিকাশ পায়। ঐ উপাদান ভেদে সৃষ্টির ভিন্নতা নিবন্ধন সদসদ্ বৃত্তি-সমূহ পরিস্ফুট হয়। এবং জনক-জননীর অবস্থা ও তাঁহাদের চিন্তা-শক্তির আকর্ষণে মনের গতির দ্বারা বিকার-নির্ব্বিকার শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট ভাব পুত্র-কন্যার প্রকৃতিতে সংক্রামিত

হয়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, পিতা-মাতার কোনরূপ উৎকট ব্যাধি থাকিলে সন্তান-সন্ততিতেও ঐ ব্যাধিটী সংঘটিত হইয়া থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু রোগের যেমন ঔষধি আছে, তেমনই কলুষিত বৃত্তি সকলেরও সাধুসঙ্গ, সদালাপ, সচ্ছাস্ত্র দ্বারা চরিত্র শোধিত হয়। কারণ শরীর-তত্ত্বের কোনরূপ অভাব হইলে, ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে, অথচ ঐ অভাবটী ঔষধিতে পূর্ণ করিলে, রোগী আরোগ্য লাভ করে। বৃত্তি সকলও শুভতত্ত্বের সংযোগে উজ্জ্বল স্বভাবে পরিণত হয়। অতঃপর সাধন-ক্ষেত্রে অটল ও দৃঢ়ভাবে অবস্থিতি করিলে, অনুরাগও অনুগত থাকিবে। নিরাশার কোন কথা নাই।

যাহা হউক, সংক্ষেপে প্রাণের স্থিতি সম্বন্ধীয় একটু আলোচনা করা যাক্। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণ আত্মার কিরণ স্বরূপ। আত্মারই প্রকার-ভেদ-শক্তি জগৎ সমূহে বিকাশ পাইয়া থাকে। জড় জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া একই প্রাণ-প্রবাহ প্রাণিগণের অস্তিত্ব রূপে স্থিতি করিতেছে। জড় বিকাশেও ইহার স্থিতি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে যে, জগতের কোনও একটী দৈহিক ভাবে অর্থাৎ উদ্ভিজ্জাদিতেও প্রাণের গতিপ্রবাহ চলিতেছে এবং অচেতন ধাতু প্রস্তর মধ্যেও ঐ অখণ্ড শক্তির স্থিতি বিলুপ্ত নহে, ইহাও জড় বিজ্ঞান প্রকাশ করিতে সক্ষম। কিন্তু উদ্ভিজ্জে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রত্যক্ষ ও প্রস্তরাদি অচেতন বস্তু মধ্যে অস্পর্শ ভাবে চিৎশক্তির কার্য্য চলিতেছে, ইহা স্বীকার করিলেও মানুষ ঐ সমূহ জড়িত তত্ত্বের বিকারে প্রাণকেও খণ্ড বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রাণ-যোগের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে বিঘ্নোৎপাদন করে। সূক্ষ্ম দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একই মহাপ্রাণের অখণ্ড প্রবাহ অনন্তাকাশ ভেদ করিয়া স্থিতি করিতেছে। সুতরাং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি সকলই একই প্রাণের অখণ্ড শক্তিতে নিবদ্ধ আছে। এবং শূন্য-ভেদী আত্মার অসীম ইচ্ছাতেই গ্রহ উপগ্রহ সকল নিজ নিজ কক্ষ প্রদেশে অবস্থিত করিতেছে। আবার অণুস্বরূপে প্রাণেই বিজড়িত থাকে, সমষ্টিতে স্ব স্ব আকৃতিতে বিকাশ পায়। কিছু ছিল না, এখন হইল, ইহা বিকার দর্শন ব্যতীত আর কিছু নহে। সকলই অনন্তকালের বক্ষে রহিয়াছে। শূন্য বাদীরা যে আকাশকেই সৃষ্টির কারণরূপী বলিয়া মনে করেন, তাহা একটু চিন্তা করিবার বিষয়। কারণ, যখন আকাশকে তত্ত্বদর্শী মনীষীরা ভূত-তত্ত্বে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন উহা সৃষ্টি বিষয়ের কোনও বস্তু উৎপাদনের শক্তি ধারণ করিতে পারে না। অবশ্য বলিতে পারা যায় যে, আকাশও বিশ্ব সমূহের অঙ্গ মিশ্রণের একটী আধার মাত্র। শূন্যাস্পর্শাতীত অখণ্ড আত্মাই একমাত্র কারণ স্বরূপ নিয়ন্তা। তবেই বলিতে পারা যায় যে, স্থূল জগতের পরমাণুর ভিতরে এবং সকল প্রকার দৈহিক কার্য্য শক্তিতে, প্রাণের গতি অস্পৃশ্য। কিন্তু তাহার অব্যর্থ ইচ্ছার কার্য্য সমূহ বন্ধ থাকে না। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বিশ্ব-মগ্ন প্রাণিগণের মধ্যে বিকার নির্ব্বিকার কার্য্য সকল প্রত্যক্ষ হয় কেন? বস্তুতঃই উহা দৈহিক তত্ত্বের বিশেষত্ব মাত্র। পার্থিব শরীর সম্বন্ধে চিন্তা করিলে জানা যায়, সকল প্রকার জন্তুতেই পরস্পর প্রকৃতি-সম্ভূত পশু-চরিত্র রহিয়াছে। মানবাদির উন্নত জ্ঞান প্রভাবে অবশ্য তাহার তিরোধান হয়, কিন্তু ব্যাঘ্র প্রভৃতি ষড়রিপু জ্ঞানে পরিচালিত, এজন্য তাহাদের পাশব প্রবৃত্তি প্রকৃতিগত। তৎসত্ত্বেও প্রাণের গতি ও স্থিতি, ভাবের

বিভিন্নতা নাই। এমন কি, হৃদয়স্থিত স্থূল বায়ুরূপী প্রাণেরও স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যায় না। অথচ ঐ বায়ুরূপী প্রাণ-তত্ত্বও জন্তু সমূহের হৃদয়াকাশের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া, ফুসফুসাদি যন্ত্রের কার্য্যক্ষেত্রে স্থিতি সত্ত্বেও জড়। উহার পশ্চাতে চিন্ময় প্রাণের তরঙ্গ রহিয়াছে, সেই তরঙ্গ বলে দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ সকল বিষয় পরে বিবৃত হইবে, এক্ষণে প্রাণ-তত্ত্বের এক ত্বের সহজ উপায় কি, তাহারই একটু আলোচনা প্রয়োজন।

আমরা স্থূল জ্ঞানের আতিশয্য বশতঃ সূক্ষ্ম চিন্তা প্রদেশে উপস্থিত হইতে পারি না। এজন্য চিৎতত্ত্বের অনুসন্ধানে বীতশ্রদ্ধ হইয়া দেহের স্বাতন্ত্র্য ভাব-জনিত প্রাণকে খণ্ড ভাবে বুঝিতেছি। ফলতঃ দিব্য চক্ষু উন্মেষিত হইলে স্পষ্টই দেখা যায়, প্রাণ অখণ্ড চিন্ময় জৈবিক প্রবাহ, ইহার স্থিতি ভাবের তারতম্য নাই। শরীরোপযোগী কার্য্য ভাবটীই আমরা দর্শন করিয়া থাকি। যোগীরা যোগ সাধনের প্রারম্ভেই প্রাণ যোগের নিমিত্ত প্রথমতঃ অভেদ ভক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হন। সাধন সিদ্ধ হইলে প্রাণ যোগের স্বাভাবিক পথ খুলিয়া যায়। বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ, ঐ অভেদ ভক্তিই এক করিয়া দেয়। বাহ্য প্রক্রিয়ার বল আর গ্রহণ করিতে হয় না। বাস্তবিকই প্রাণযোগ স্থূল প্রাণায়ামের অতীত। প্রাণের "ভেদত্ব বিনাশ", উহাই প্রকৃত "প্রাণায়াম", ইহারই আশ্রয়ে মানুষ সাধনের পথে অগ্রসর হইয়া যোগরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পূত প্রজ্ঞা বলে স্বাভাবিক যোগের সরল তত্ত্ব সমূহ হৃদয়-গ্রন্থে বুঝিতে পারে। নির্ম্মল পবিত্র চরিত্র গঠন করিতে পারিলে তখনই ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে অধিকার জন্মে। সকলের মধ্যে অভিন্ন প্রাণের যোগ—জ্যোতিশ্চক্ষুতে স্পষ্ট রূপে দেখা যায়, এবং সরলতার অমিয় আকর্ষণে প্রীতির অব্যাহত গতি প্রবল হইয়া উঠে। সেই সময়, প্রাণীভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ, আসক্তি-জনিত রুচি-ভেদ—এই সকল ভীষণ বিঘ্ন দ্বারা সাধনের যে অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও জানিতে সক্ষম হয়। জগতে যত প্রকার ভেদ দেখা যায়, তাহার মধ্যে "প্রাণী ভেদ"ই, যোগের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ, প্রাণতরঙ্গটী অবলম্বন না করিলে, আত্মার সহিত যোগ হওয়াও অসম্ভব। এখানে যুক্তি ও বিচার জ্ঞান পরাস্ত—স্বাভাবিক জ্ঞানের সর্ব্ব-প্রকার অধিকার আছে। এই জ্ঞানকেই অনাবৃত তত্ত্ব-জ্ঞান বলে। ইহারই সাহায্যে সরল যোগ-পথ লাভ হয় এবং উৎকট সাধনের নিমিত্ত সময় পাত করিতে হয় না। ইহাতেই হৃদয়-নিঃসৃত অভ্রান্ত তত্ত্ব সমূহ আপনা হইতে উদ্ভূত হইয়া নিরাশার ঘোর তিমিরে আশার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকাশ পায় এবং হৃদয় মধ্যে কি যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-উচ্ছ্বাস মুহুর্মুহু উত্থিত হইতে থাকে, তাহার আবেগ ধারণা করা বড় সহজ নহে। ইহার মূল কারণই প্রাণের সর্ব্বগত একত্ব ভাব।

প্রাণ, বাহেন্দ্রিয়াদিতে পরিচালিত নহে। আত্মার শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। স্বাভাবিক জ্ঞান ভিন্ন এই গূঢ়-তত্ত্বের সিদ্ধান্তে কেহ উপনীত হইতে পারে না। শরীরস্থ ভৌতিক পদার্থ-সমূহ ও স্নায়ু-মণ্ডল প্রভৃতি ঐ প্রাণেরই প্রতিঘাতে সঞ্জীবিত ও পরিচালিত; কেন না প্রাণ যে আত্মার চিদাভাস। তাহারই সাধনাতে মনঃশক্তি ও সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়াদির বহির্ম্মুখ গতির পথ রোধ হয়। তবে বুঝিতে হইবে যে,

ঐ মনঃশক্তি ও ইন্দ্রিয়াদির বল এখানে তুচ্ছ —কারণ অতীন্দ্রিয় পরম বস্তুর সাধনে যখন উহারা দমিত বা পরাজিত হয়, তখন কঠোর প্রক্রিয়ার প্রতি স্পৃহা প্রদর্শন করা সময়পাত ব্যতীত সম্ভব নহে। শান্তির অমৃতছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে, প্রাণীতত্ত্বের ভিতরে প্রাণের মধুর প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া আত্মার চিৎপ্রভাব স্ফূর্ত্তি সর্ব্বাধারে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। তাহা হইলে সেই প্রাণই চিন্ময়-রাজ্যের অসীম জ্যোতিতে মিশিয়া যোগনিষ্ঠ ব্যক্তিকে আকুল করে এবং স্বাভাবিক-যোগের সহজভাবে অন্তঃকরণ শান্তি-রসে আপ্লুত হয়, আর বাহ্য-জগতের সঙ্কীর্ণতাদির প্রাদুর্ভাব প্রবল হইতে পারে না। বহির্চিন্তা সকল দূরীভূত হইয়া মনের একাগ্রতা, শুভ-বৃত্তি-সমূহের সদ্ব্যবহার, আসক্তিময় প্রকৃতির নির্ম্মল-চরিত্র বিকাশ পায়। ক্রমে ক্রমে সাধনের নিগূঢ়-তত্ত্বগুলি পরিস্ফুট হইতে থাকে. যেদিকেই দৃষ্টি পড়ে, সমস্তই যেন আপনার বলিয়া বোধ হয়। বলিতে কি, ঐ ক্ষতাঙ্গ রুগ্ন-ভগ্ন-শরীর দরিদ্র ভাইটীর মুখ-চুম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই দিক্‌ভেদী বিশুদ্ধ সময়ে হৃদয়াকাশ মহাকাশ এক হইয়া যায়। বস্তুতঃই তাহার অভ্যন্তরে অসীম মহা চৈতন্যের সত্তা-সিন্ধুর অতল তলে প্রবেশ করিবার শক্তি জন্মে ও ভূমানন্দ লাভ হয়। স্বভাবতই প্রাণী ও প্রাণের মহা মিলনে আত্মার অমিয়-প্রবাহ অন্তঃকরণের গূঢ় প্রদেশে প্রবেশ করিয়া শান্তির স্নিগ্ধ উচ্ছ্বাসে শীতল করে। স্বাভাবিক যোগনিষ্ঠ যোগীরা কৃচ্ছ্র সাধন-শৃঙ্খলে আর বদ্ধ না থাকিয়া দেব-প্রদত্ত সহজ সরল পন্থার অনু-শীলনে ব্যগ্র হন। তাঁহারা কোন প্রকার বাহ্য প্রণালীর প্রতি নির্ভর করেন না। সেই অনাদি অনন্ত-প্রসারিত মহাজ্যোতির ভিতরে হৃদয়ের বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার নিমিত্ত নিয়ত নিরত থাকেন। এবং প্রাণযোগের মধুর তরঙ্গে ডুবিয়া যান। শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস।

লুপ্তোদ্ধার। (৩)

গাং

শিব-শিরোত্থিতা পুণ্যসলিলা, ভগীরথের শঙ্খধ্বনি অনুসরণ করিয়া বিধ্বস্ত সগর রাজ-বংশের উদ্ধারের জন্য সাগর-সম্মিলনে আত্ম-হারা হইবার পূর্ব্বে,পথিমধ্যে যে নাম কতিপয় ধারণ করিয়াছিলেন,তন্মধ্যে 'গঙ্গা' 'ভাগীরথী' ও আধুনিক বিজাতীয় ম্লেচ্ছ 'হুগলী' এই নামত্রয় এস্থলে প্রাসঙ্গিক। আ-হুগলী গঙ্গো-ত্তরী নাম গঙ্গা। ইহার পৌরাণিক নামান্তর এতদ্ধেতু ভাগীরথী। কিন্তু এস্থলে ইহাও বুঝিতে হইবে যে 'ভাগীরথী' নামে মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গারই একটী শাখা আছে। মায়ের নামে মেয়ের নামকরণ সামাজিক ভাবে অযৌক্তিক বটে, কিন্তু মাতৃপরকতা সং-রক্ষণের নিমিত্ত প্রাচীন হিন্দুগণ বোধ হয় এই-রূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খ্যাতনামা পর্য্যটক যেরূপ অতি সাবধানে স্বনাম গোপন করিয়া পর্য্যটন করিয়া থাকেন, তথাপি তাহা কোনও না কোন প্রকারে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, গঙ্গা সম্বন্ধেও যেন তাহাই হইয়াছে। অখিল আর্য্যাবর্ত্তপরিভ্রমণ-কারিণী যেন ধন ধান্যে ও স্নিগ্ধ সলিলে পরিতৃপ্ত করিয়াও সাগরাঙ্গে

লুক্কায়িত হইবার পূর্ব্বে আত্ম গোপন করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, কথা হইতেছে এই যে, আধুনিক বিজাতীয় ম্লেচ্ছ নাম 'হুগলী' কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তরে আমি বলি যে, গঙ্গার তীরবর্ত্তী হুগলী নগর হইতে ইহা যে আসিয়াছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। নগরের নাম হইতে জেলার নাম, আংশিক নদীর নাম হইয়াছে। অর্থাৎ যে নদী বা গঙ্গার যে অংশ হুগলী নগর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার ইঙ্গ-বঙ্গ ম্লেচ্ছ নাম হুগলী হইয়াছে। হুগলী নামইবা কোথা হইতে আসিল? অপরাপর স্থানীয় নামের মত ইহা দেশীয় সংস্কৃত বা বাঙ্গালা মূলক নহে। এবিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, হুগলীর পূর্বাতত্ত্ব যত দূর সম্ভব, সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিতে হয়। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের দৌরাত্ম্যে ও মগ এবং মুর বা মহম্মদীয় জলদস্যুদিগের উপদ্রবে প্রাচীন সময়ে দ্বীপের প্রভৃতির বাস ব্যতীত ভদ্রলোকের আদৌ বাস ছিল না বলিলেই হয়। যাহারা নদীতীরে বাস করিত, তাহারাও সর্ব্বদা প্রাণটী হাতে করিয়া বাস করিত। বঙ্গদেশে মগদিগের অত্যাচার এত হইয়াছিল যে, উহা হইতে যেন মগের মুল্লুক, এই প্রবাদ উঠে। ইহার উপর আবার য়ুরোপ হইতে পর্ত্তুগীজ দেখা দিল। আলবুকার্কের পর্ত্তুগীজ-ভারত-শাসন কালে মালবর ও করমণ্ডল্ উপকূলে মুর ও আম্মানীদিগের সহিত যে ভয়ানক জলযুদ্ধ হয়, তাহা ইতিহাসের কথা। সুতরাং তদ্বিষয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পর্ত্তুগীজেরা যেমন একদিকে মুরদিগের অত্যাচার, সম্পূর্ণ না হউক, কিয়ৎপরিমাণে দমন করিলেন, তেমনি, নিজেরা দুষ্প্রবৃত্তি বশবর্ত্তীর হইয়া ঘোর অত্যাচারী হইলেন। যাঁহারা রক্ষক, প্রত্যুত তাঁহারাই যখন ভক্ষক হইয়া উঠিলেন, তখন কি আর মঙ্গল আছে? তাঁহাদিগের প্রাবল্য ও প্রাধান্য এত দূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, পর্ত্তুগীজদিগের এসিয়ার অন্তর্গত বিস্তৃত অধিকারভুক্ত ও সসাগর দেশগুলি সেই সময়ে সাত ভাগে বিভক্ত ছিল। কুমারিকা অন্তরীপ হইতে করমণ্ডল উপকূল পর্য্যন্ত নিগাপত্তন্, মশলিপত্তন্, উড়িষ্যা এবং মেলিয়াপুর প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী সুন্দর সুন্দর স্থান সমূহ পঞ্চম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। * এই মেলিয়াপুর হুগলীর নিকট। ইহার একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, বর্‌সি বন্দর, যাহা হইতে বর্ত্তমান অপভ্রষ্ট ব্যাণ্ডেল নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্যাণ্ডেলের পর্ত্তুগীজদিগের গির্জ্জা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাচীনতম খ্রীষ্টীয় ভজনালয়। এই স্থানে একজন বিশপ্ থাকিতেন। তাঁহার চাকলা খ্রীষ্টীয় পৌরোহিতিক সাহিত্যে সেণ্ট টমাস্ নামে অভিহিত। মেলিয়াপুরে নভেম্বর মাসে এখনও রোমান্ ক্যাথলিক মতাবলম্বীদিগের মেলা হইয়া থাকে। তখনও অদূরবর্ত্তী সপ্তগ্রামের গৌরব-সূর্য্য অস্ত যান নাই, অন্য গ্রহকে আশ্রয় দান করিয়া আলোকিত করিতেছিলেন। ব্যাণ্ডেলের নাম পাওয়া যাইতেছে, সপ্তগ্রামের নাম পাওয়া যাইতেছে এবং মেলিয়াপুরেরও নাম পাওয়া যাইতেছে। হুগলীর নাম পাওয়া যাইতেছে না। তাহার কারণ কি? তাহার কারণ আর কিছুই নয়, হুগলীর তখনও নামকরণ হয় নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই নাম-

* Portuguese Asia by Manuel de Faria Y Sousa translated into English by Captain John Stevens

† Seir Mutaqherin, Vol 3 p 179

কবণ কাহা বর্ত্তৃক কোন্ সমযে হইযাছিল। ডচ্‌দিগেব প্রদত্ত নহে, কাবণ বিখ্যাত ঐতিহাসিক অর্ম্মী (Orme) বলেন, তাহাবা অনেক পবে, ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে আসিযাছিল এবং তাব পব পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইযা দিবাব জন্য শত্রুব সহিত যোগদান কবিযাছিল। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, পর্ত্তুগীজেবাই ইহাব "গোলিন" (Golin) বা "অগলিম" (Ugolyin) নাম দিযা থাকেন। তাহা হইতে যে বর্ত্তমান হুগলীব নাম হইযাছে, তদ্বিষযে অনুমাত্র সংশয নাই।* উল্লিখিত পর্ত্তুগীজ ইতিহাসে লিখিত আছে যে,—"In the beginning of the year 1633, the Portuguese lost Golin. *The Mogul (Shah Jehan) having* lost above 50000 horse in the preceding year in several engagements that he had with Hidalcan attributed it to the assistance the latter received from the Portuguese In revenge he (Shah Jehan) besieged Golin with almost 200000, men by land and a vast fleet sent down the *Ganges. In the place (Golin)* were 200 Portuguese and their slaves, who defended themselves several days..... .....killing 50000 Moguls The defeated Portuguese attempted to escape by four vessels two of which were full of women and children and vast riches. They preferred death to slavery under the Moguls. So they set fire to the vessels and burnt themselves to death with their treasure. The other two preferred the same fate" †

অর্থাৎ, ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দেব প্রাবম্ভে পর্ত্তুগীজেবা গোলিন্ (হুগলী) অধিকাব-চ্যুত হন। ইহাব আগেব বৎসব মোগল সম্রাট্ শাজাহাঁ ৫০০০০ অধিক অশ্বাবোহী সৈন্য হিদল্ খাঁব সহিত যুদ্ধে হাবাণ। তাঁহাব বিশ্বাস যে, পর্ত্তুগীজেবা হিদল খাঁকে সাহায্য কবিযাছিল বলিযাই এইরূপ পবাজয ঘটে। ইহাব প্রতিশোধ লইবাব জন্য সম্রাট ২০০০০০ দুই লক্ষ সৈন্য সমেত স্থল পথে ও জল পথে গোলিন্ আক্রমণ কবেন। এখানে ২০০ দুইশত পর্ত্তুগীজ ও তাহাদিগেব কৃতদাস ছিল। অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণ অনেক দিন ধবিয়া যুদ্ধ কবে। ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজাব মোগল মাবা যায। পর্ত্তুগীজগণ জাহাজে কবিযা পলাইতে চেষ্টা কবে, দুখানি জাহাজে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা এবং প্রচুব অর্থ ছিল। তাহাবা মোগলদিগেব দাসত্ব স্বীকাব কবা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয মনে কবিল। জাহাজে আগুন লাগাইযা অর্থসহ ভস্মীভূত হইল। অপব দুইখানি জাহাজেব লোকেবাও তাহাই কবিয়াছিল। উল্লিখিত হিদল্ খাঁ কে? ইনি বিজয়পুব অধিপতি যুসুফ আদিল খাঁ ব্যতীত কেহই নহে।†

গোলিন শব্দেব ব্যুৎপত্তি কি? গোলা হইতে 'গোলিন' হইয়াছে।‡ ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তখন হইতে ধান্য এবং অন্যান্য শস্য গোলাজাত কবিয়া লোকে ব্যবসা কবিত। ইহা ব্যবসাব স্থান ছিল। এই

* Good old Days of the Hon'ble John Company by W H Carey Rev G U Pope's Text Book of Indian History p, 110

† F. C Danver's Portuguese in India.

‡Rev. G U Pope's Text Book of Indian History p, 110.

স্থানে ও ব্যাণ্ডেলে পর্ত্তুগীজদিগের উপনিবেশ ছিল।‡ এই নিমিত্ত পর্ত্তুগীজ-প্রদত্ত "গোলিন" বা "অগোলিম" নাম হইতে স্থানের বর্ত্তমান ইঙ্গ-বঙ্গ ম্লেচ্ছ নাম হুগলী হইল। কোন্ সময়ে নাম প্রদত্ত হইল? উক্ত ইংরাজি অনূদিত উদ্ধৃতির প্রথমেই আছে যে, সম্রাট্ শাজাহাঁ ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজদিগকে হুগলী হইতে উচ্ছেদ করেন। এই ঘটনার অনেক পূর্ব্বে নগর নিশ্চয়ই সংস্থাপিত হইয়াছিল। অনেক গবেষণার পর ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দ সংস্থাপন কালে উপনীত হইয়াছি। পঞ্চস্রোতস্বিনী স্বনাম-আখ্যাত পঞ্জাবে প্রেমে গড়াইয়া ক্ষান্ত রহিলেন না, শেষে যুক্ত-সলিলার ইঙ্গ নাম ইণ্ডস্ দিয়া বিস্তৃত উপদ্বীপের নাম ইণ্ডস্ স্থান বা হিন্দুস্থান দিয়া (যদিও ইণ্ডস স্থান বা হিন্দুস্থান বলিলে আর্য্যবর্ত্তকেই বুঝাইয়া থাকে) ভারত রাজ্যে প্রেমে গড়াইয়া প্রাচীন মহত্ত্বে আপামর নির্ব্বিশেষে প্রেম বিলাইতেছেন। সহোদর গঙ্গা তাহা করিলেন না। ভাগ্য-চক্রের আবর্ত্তনে কুলোকের হস্তে নিপতিতা হইয়া হুগলী নাম ধারণ করিলেন।

কাহারও অবিদিত নহে যে, সাগর-সঙ্গম পরম পবিত্র তীর্থ স্থান। ইহা ব্যতীত হুগলীনদীর পবিত্রতা কতদূর, এক্ষণে তাহা উল্লেখযোগ্য। শিবপুরের নিকট ব্যাতোর নামে একটী গণ্ডগ্রাম আছে। এখানকার বেতাই চণ্ডী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্রীমন্ত সওদাগর জলযাত্রা কালীন এখানে নঙ্গর করিয়া চণ্ডীর পূজা করিয়াছিলেন। তদনন্তর আধুনিক টালির নালা নামোক্ত আদি-গঙ্গা দিয়া তিনি বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করেন। আদি গঙ্গার তীরবর্ত্তী যে সমস্ত স্থান তাঁহার জলপথে পড়িয়াছিল, সে সব এখনও বর্ত্তমান। আদি গঙ্গা হুগলী নদীর সহিত যেস্থলে সম্মিলিত হইয়াছে, তাহার কিছু পশ্চিম পর্য্যন্ত হুগলী নদীর পবিত্রতা ছিল। ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থলটী এক্ষণে খিদিরপুর ডকের খালের মোহানার অন্তর্গত। গবর্ণমেণ্ট ডকের পার্শ্ববর্ত্তী বলিয়া সাধারণে উহাকে কলঘাট বলিত। কলঘাটে বিস্তর লোক গঙ্গা স্নান করিত, আমিও বাল্যাবস্থায় তথায় গঙ্গাস্নান করিয়াছিলাম। এই অবধি হুগলী নদীর পবিত্রতা ছিল ও আছে। তদতিরিক্ত পশ্চিমে পবিত্রতা নাই, কারণ তৎ পশ্চিম তদ্গতি-ভাগকে লোকে 'কাটা গঙ্গা' বা গাং বলে। সুতরাং তাহাকে হুগলীর গাং বলিয়া উল্লেখ করিলাম। গাং শব্দ গঙ্গা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। ইহার অর্থ জল-বেগ বা ব্যাপিড্ বা টরেণ্ট। এই অর্থে ইহা শিব-দরিয়া ও আমু-দরিয়ার মত অপরাপর নদনদীর নামের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা রূপনারায়ণের গাং, হলদির গাং এবং দামুদরের গাং। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহারের পূর্ব্বে, কাহারা এই গাং কাটাইয়া বঙ্গোপ-সাগরের সহিত মিলাইয়া দিয়া গঙ্গার গতি ফিরাইয়া দিল, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। বাণিজ্য-সৌকর্য্যার্থে পর্ত্তুগীজেরা যে এই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর ইহা যে হুগলী নগর সংস্থাপনের সময়ে অথবা সপ্তগ্রামের গৌরব-সূর্য্য অস্ত গেলে, হইয়াছিল, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যে বহির্মুখ বাণিজ্য আদৌ ছিল না, তাহা সম্ভব-পর নহে, কারণ অতি প্রাচীন সময় হইতে মুর বা মুসলমানগণ ভারতবর্ষের দ্রব্যজাত লইয়া ফিনিসিয়ান্দিগের নিকট বিক্রয় করিত।

‡ F. C Danver's Portuguese in India Vol 2. p 247.

তাহারা উহা লইয়া বিলিস্ নগরে য়ুরোপীয়দিগের নিকট অধিক মূল্যে আবার বিক্রয় করিত। তবে এতটুকু এস্থলে বলিয়া রাখি যে, খাল কাটাইতে যে বিদ্যা বুদ্ধির আবশ্যক, তাহা তাহাদিগের ছিল না। গায়ের পর্ত্তুগীজ, আর্মাণী, মগ প্রভৃতি দুর্বৃত্তেরা দস্যুবৃত্তি করিয়া বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিত। পর্ত্তুগীজেরা অপসৃত হইলে ইংরাজ আমলেও বোম্বেটিয়া বা জলদস্যুর ভয় ছিল। পূর্ব্বে হিজিলি ও কাঁথি হইতে ধান্য বা চাউল বা উভয় দ্রব্য পরিপূর্ণ বড় বড় হোলা বা প্রশস্ততল বড় বড় মালের নৌকা, (যাহাকে ইংরাজীতে Cargo boat বলে) আসিত। বাত্রিকালে দস্যুগণ তৎসমস্ত হইতে সর্ব্বস্বাপহরণ করিত। এ সম্বন্ধে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম-তলবিশিষ্ট কুচিবেড়িয়ার দ্রুতগামিনী নৌকারোহী বোম্বেটিয়া বা জলদস্যুগণের নামে এখনও আমাদিগের হৃৎকম্প হয়। কুচিবেড়িয়া কোথায়, তাহা অদ্যাবধি জানিতে পারি নাই; বোধ হয় শীঘ্র পারিব। ইংরাজের সুশাসনে জল-পুলিসের সৃষ্টিতে ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় ইহাদিগের বিষয় আর শুনা যায় না।

শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

"কাজের সংজ্ঞা ঘুচ্‌লো এবার।"

দীর্ঘ ছন্দে ঘণ্টাগুলো বাজায় আলস রাগিণী,
কার্য্যহীনের নিদ্রাশূন্য দীর্ঘ নিদাঘ রজনী।
অর্দ্ধ সুপ্ত মলয় বহে, অর্দ্ধ মগ্ন পাপিয়া গাহে,
মুদিয়া আসে নিদ্রা-অলস নয়ন দিবস যামিনী॥

শ্রান্তিশূন্য মুহূর্ত্তেরা ফুলের গন্ধে সন্তরিয়া
নিদাঘ-তপ্ত দুপুর বেলায় বেড়ায় মৃদু সঞ্চরিয়া।
জাগরণহীন স্বপন ঘোরে, হৃদয় শুধু গিয়াছে ভ'রে,
কাজের বিশ্ব লুকিয়ে গে'ছে দীর্ঘ দিনের বিদায় নিয়া॥

খেলা শুধুই মূর্ত্ত হ'য়ে আমার সাথে বেড়ায় নেচে,
কাজের দিনের সকল সাথী অন্তরালে বিদায় নে'ছে,
(বেড়াই) সঙ্গে ল'য়ে কল্পনারে—হৃদয়-শৈলে শৃঙ্গ পরে,
মুক্ত বাতাস রৌদ্র নীরে নয়নের রং বদ্‌লে দে'ছে॥

বন উপবন নগর পাহাড় শিখর হ'তে সব একাকার,
তুলি দিয়ে পটে আঁকা শুধুই কেবল রঙের বাহার,
শ্রান্তি রঙ্গীন্ নয়ন মেলে স্বপ্ন দেখি সত্য ফে'লে,
স্বপ্নে সত্যে বদল হ'লো কাজের সংজ্ঞা ঘুচ্‌লো এবার॥

শ্রীপদ্মবন্ধু ঘোষাল।

চির-নিদ্রিতের প্রতি।

(১৩১৫, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, পূর্ণিমা।)

"হাবো নাবোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষ ভীরুণা।
ইদানিমাবয়োর্ম্মধ্যে সবিত্‌ সাগর ভূধরাঃ॥"

১

সংসারের শত শত ঘাত প্রতিঘাতে,
হ'য়েছে তাহার ক্ষুদ্র তনু জরজর।
জুড়া'তে প্রাণের জ্বালা কনক প্রতিমা;
লভি'ছে বিরাম সুখ-শয্যার উপর॥

২

সংসার-শোভনা রামা রমণী-রতন।
চির সুখ নিদ্রা-ঘোরে রয়েছে মগন॥
ডেকোনা তাহারে, আহা! একটু ঘুমাক্।
জুড়াক সংসার-জ্বালা—থাক্ একটু থাক্॥

৩

আদরিণী হৃদিরাণী সুশীলা আমার,
পেতেছিল কত আশে আপন সংসার।
বুঝেনি সরলা বালা, এত জ্বালা হ'বে;—
উত্তরিতে ভবসিন্ধু—অনন্ত অপার॥

৪

জুড়াইতে জ্বালা তাই লযে অবসব।
লভি'ছে বিবাম শেষ শয্যাব উপব॥
ডেকোনা তাহাবে আহা। একটু ঘুমাক্।
বাড়া'ওনা জ্বালা আব—থাক একটু থাক্॥

৫

দিযেছিল প্রণযিনী ক্ষুদ্র হৃদি খানি,—
সংসাব-সাগব-স্রোতে—আপনা হাবা'যে।
নাবিল সহিতে বাযু ঘাত প্রতিঘাত,—
ডুবিল আপনি—হায। আমাকে কাঁদা'যে॥

৬

আহা। ক্লান্ত কান্তা মম নযন-শোভনা।
বযেছে শযান ওই—ভুলিতে যাতনা॥
ডেকোনা তাহাবে আব একটু ঘুমাব্॥
জাগিলে বাড়িবে জ্বালা—থাক্ একটু থাক্॥

৭

আব না ডাকিবে কেহ—সহিবে না জ্বালা,
ঘুমাও অনন্ত সুখে মোব হৃদি-বাণি।
এই নিশি পৌর্ণমাসী—স্নিগ্ধ সমীবণ,
করুক শীতল তব দাহ হৃদিখানি॥

৮

কি সুখেব নিদ্রা আজি লভিলে সুন্দরি।
এ ঘুমেব ঘোব ভবে ভাঙ্গিবে না আব।
আমিই বহিনু জাগি' মুছি' নেত্র-নীব,
সহিতে যন্ত্রণা—স্মৃতি লইযা তোমাব॥

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ

প্রেমেব সংজ্ঞা।

রহিয়া বহিয়া দগধি' দগধি'
হৃদয-অনলে পোড়া,—
তাবি নাম প্রেম—ভালবাসা,
যাব দেশে দেশে এত সাড়া।
ভুলি' আপনাব সুখ সমুদয়
পবেব কাবণে মবা,
কত না যতনে যাতনা পোষণ
পীবিতেবি এই ধাবা।

অবসান-হীন কামনা থাকিবে
নিযত জাগিযা মনে,
অবসাদহীন হৃদযে সাধিতে
হইবে পবাণ পণে।
পবেব কাবণে জীবনে সমাধি;
হায, প্রেম তোব নাহিক অবধি।

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্পর্দ্ধা।

মহান তুমি　　বিশ্বপতি
অন্ত তোমাব নাই,
স্পর্দ্ধা আমাব　　ক্ষুদ্র বুকে
তোমায বাঁধ তে চাই।

বাহু-ডোবেব শিথিল বাঁধন,
তুচ্ছ সে যে—তোমাব বাজন,
সাধ্য কি যে বাখ তে পাবি,
শক্তি আমাব নাই,
তবু কেন　　স্পর্দ্ধা আমাব
তোমায বাঁধ্ তে চাই।

হৃদয আমাব　　স্মবণ যাচে
তোমাব চবণ মূলে।
তোমাব দেওযা　　পথে যাইনে,
কোন্ পথে যাই ভুলে?
যেথায থাকি যাইনে যেথায,
স্পর্দ্ধা জাগে, প্রাণে আমায
দেহ ধবা তুমিই যেন
আমাব নযন জলে।
তোমাব মাঝে　　আছি তবু
স্পর্দ্ধা "আমার" বলে।

শ্রীবমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাতৃহারা।

বিশাল প্রান্তর, ওই দূরে যায় দেখা,
শ্যামল পল্লীর বক্র বন-মসী-লেখা।
ম্লানমুখী মৌন সন্ধ্যা নামিতেছে ধীরে,
আচ্ছন্ন করি এ বিশ্ব ভয়াল তিমিরে।
হেনকালে,—যে সময়ে চলে' গেছে সবে—
মাতৃহারা একা বৎস কাঁদে হাম্বা রবে।
ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল স্বর স্তব্ধ সন্ধ্যাকাশে
ধ্বনিয়া উঠিছে শুধু, করুণ নিঃশ্বাসে,
বহে' যায় বায়ু কোন্ অসীমের পানে।
স্তম্ভিত এ ধরা যেন কি গভীর ধ্যানে।
কোথা এর মাতা? সে যে গেছে অনিচ্ছায়,
রাখালের সনে গূঢ় মর্ম্ম বেদনায়,
অর্থপূর্ণ হাম্বারবে ডাকি' বারম্বার,
সন্ধ্যার প্রান্তরে ফেলি' একা বৎস তার।
এবে কোন্ গৃহস্থের নিভৃত কুটীরে
অন্ধকারে একাকিনী স্মরি' বৎসটারে,
জননী সে আর্ত্তস্বরে ডাকিতেছে হায়।
শুধু ডাকাডাকি—কিছু শোনা নাহি যায়।
তমোময় ব্যবধান উভয়ের মাঝে
ব্যর্থ এ আহ্বানে শুধু ব্যথা বক্ষে বাজে।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তুমি।

দেখেছি তোমারে তুমি বসন্তের বায়ু,
দেখিয়াছি মৃত প্রাণে তুমি কোটী আয়ু।
দেখেছি চাঁদের মুখে তুমি সুধাধার,
দেখেছি সে স্বচ্ছটা তুমি তারকার।
দেখেছি পূরবী মাঝে, সে অমিয় তুমি,
মধুপ উন্মত্ত যাহে পরিমল চুমি।
দেখেছি জলদ কোলে হেসে দিতে দেখা,
দেখেছি আঁধারে তুমি সে বিজলী রেখা।
দেখেছি তোমারে আমি পাপিয়া ঝঙ্কারে,
দেখেছি সে মন্দাকিনী বেগবতী ধারে।
দেখেছি মরতে আমি দেখেছি স্বরগে।
দেখেছি নিশীথ রাতে শুভ্র দিবালোকে।
দেখেছি সে কোটী স্বর্গ দেব অমরার,
দেখেছি তুমিই সেই স্বরগ আমার।
দেখেছি এ প্রাণ নিয়ে ঢেলে দিতে তোরে,
দেখেছি অনন্ত তুমি হাসাইতে মোরে।
দেখেছি এ বিশ্বভরা তুমি শুধু তুমি,
দেখেছি ও রূপে ভরা এই চিত্তভূমি।

শ্রীমতী বিভাবতী সেনগুপ্তা।

পরামর্শ।

বৃষ্টি যদি এসেই থাকে, হো'ক্—
উঠেই থাকে ঝড়,
তবে তুই আয়—ওরে।
এই বাণীটী ধর।—
চুপটি ক'রে আপন ভাবে,
আপন মনে আপন ভাবে,
চল্‌বি বেগে, সঠিক বেগে,
আপন পায়ে ভর।
আঁধার যদি ঘিরেই থাকে, তোর—
ভেঙ্গেই থাকে ঘর,
বলি শোন্ হা অভাগা,
এই বাণীটী ধর।—
জ্বালিস্‌নেকো নেভা বাতি,
খুঁজিসনেকো সাথের সাথী,
ক্ষ্যাপার মত ধরিস ব্রত,
দিস্‌নি কারেও কর।
কা'রে ডাকিস?—কেউতো নাই।
মুঠোয় মুঠোয় পড়ছে ছাই,
ভুল্‌লি যে তুই সকলটাই,
পোড়ার কপাল!—সব্।
হারে আপন ভোলা নর।

শ্রীনীরদবরণী দেবী।

শান্ত দৃষ্টি।

আজি মোর প্রাণের মাঝার,
তব সৌম্য শান্ত দৃষ্টি, কবিছে কি সুধা-বৃষ্টি,
ক্ষণে ক্ষণে জাগি অনিবার।
বেদনা-কাতর হৃদি লয়ে,
শত ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে,
যখনি তোমার পাশে, দাঁড়ায়েছি শান্তি-আশে,
মুছে করে গেছে অশ্রু-ধার।
তব চারু আঁখি নীলোৎপল,
কি গভীর প্রেমে নিরমল,
পুণ্য-দিঠি-গঙ্গাজলে, এ দগ্ধ বসুধা-তলে,
অভিষেক করিত আমার।
সে পবিত্র জাহ্নবী-ধারায়,
স্নাত হয়ে অতর্কিতে হায়,
সংসারের ধূলি-গ্লানি, সকলি পাশরি বাণি,
লভিতাম কি হর্ষ-অপার।
কত গান কত মত সুর,
কত কাব্য মহান্ মধুর,
দৃষ্টির আড়ালে তব, হত সৃষ্টি নব নব,
উথলি উঠিত পারাবার।
মুগ্ধ চিতে সকল সময়,
বহিতাম হয়ে তাহে লয়,
বুঝি মোর প্রাণে মনে, শুনিতাম ক্ষণে ক্ষণে,
ত্রিদিবের বীণার ঝঙ্কার।
আজন্মের মানসী আমার,
তুমি ছিলে দেব-উপহার,
হলে কভু পথহারা, তব দৃষ্টি ধ্রুবতারা,
দেখাইত স্বরগ-দুয়ার।
আজি শুধু সেই স্মৃতিটুক্,
পূর্ণ করে আছে মোর বুক,
সারাটী জীবন দিয়ে, পারনা পারনা প্রিয়ে,
এ জনমে দেখা তব আর।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সাধক।

ওগো স্বপন-দেশের রাণি।
তোমার ধেয়ানে মগ্ন অনুখন
ক্ষুদ্র হৃদয় খানি।
কবে সে মধুর জীবন-উষায়
দিয়েছিলে দেখা খেলায় ধূলায়,
সকল বক্ষে শুনেছিনু তব
জীবন-জুড়ানো বাণী।
না জানি কখন সর্ব্বস্ব মম
পূজার অর্ঘ্যে ফুলরেণু সম
আপনা-হারাণো পুলকে সঁপিনু
তোমার চরণে আনি।
ওগো স্বপন-দেশের রাণি।
তোমারি ধেয়ানে মগ্ন আমার
ক্ষুদ্র হৃদয় খানি।

ওগো সফল-সাধনা মম।
জীবন-মরণ করিলে হরণ
একি প্রেমে নিরুপম।
কত কাল আজ কোথা চলে যায়
আমি আছি রত তোমারি পূজায়—
অদৃশ্য-করে না বুঝি কখন
বাঁধিলে নিবিড়তম।
কত দূরে পড়ে বিশাল ভুবন
কবে যায় মোরে বৃথা আবাহন—
আমি যে তোমারি সেবক ভিখারী
ঘুচেনি তাহার ভ্রম।
ওগো সফল-সাধনা মম।
জীবন মরণ করিলে হরণ
এ কি প্রেমে নিরুপম।
ওগো স্বপন-দেশের রাণি।
তোমাতে আমাতে ঘটিবে মিলন
কবে কিছু নাহি জানি।
নিশিদিন তবু আছি সে আশায়

হাজার জনম ছায়ায় মিলায়,
সমুখে কেবল অমিয়া-মধুর
আলোকের রেখা টানি।
তুমি যে আমায় দিয়েছিলে দেখা
ভালবেসেছিলে মোরে শুধু একা,
তাহারি গৌরবে সকল দুঃখ
নিনু দেব-দান মানি!
ওগো স্বপন-দেশের বাণি!
তোমারি ধেয়ানে মগ্ন আমার
ক্ষুদ্র হৃদয় খানি।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বঙ্গ-বীর।*

ভাই, তুমিই কি সে বীর?
সভা মধ্যে দাঁড়াইয়া, প্রশান্ত, উজ্জ্বল হিয়া,
প্রতিজ্ঞায় বলেছিলে জলদ গম্ভীর—
হে আমার মাতৃভূমি, তব নামে আজি আমি,
শপথ করিয়া বলি—যে শক্তি আমার,
নিয়োজিব শুভ কর্ম্মে জননী তোমার।
ভাই, তুমিই কি সে বীর?
সেদিন আগ্নেয় মন্ত্রে, উদ্বোধি হৃদয়-যন্ত্রে,
তুলি হিমাদ্রির মত সমুন্নত শির,
লইলে পবিত্র ব্রত— ত্যজিলে জন্মের মত
মনুষ্য-বিক্রয় রূপী জঘন্য ব্যবসা,
পরার্থে আপন স্বার্থ ডুবায়ে সহসা।

হায় হায় হায়—
বাঙ্গালীর পণ বুঝি জল-রেখা প্রায়!
বার শত মুদ্রা তরে, আজি তুমি অকাতরে
বেচিলে নিজের ছেলে—দুঃখ কব কায়?
স্বার্থ পুন জয়ী হল, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া গেল,
তরঙ্গিণী-তট যথা প্রবল বন্যায়।
ক্ষুদ্রমনা বঙ্গবীর, নোয়ালে নিজের শির,
কলঙ্ক-কলিমা দিলে স্বজাতির গায়;
"বাঙ্গালী-কসাই"-দলে, পুন নাম লিখাইলে,
লভিলে নবীন কীর্ত্তি, নব প্রতিভায়।
কন্যার পিতার শাপে দেখ ঊর্দ্ধে, মনস্তাপে
পিতৃগণ ফেলে অশ্রু তব নীচতায়॥
ধিক্ শিক্ষা, আজি খর্ব্ব, ধিক্ তব বংশ-গর্ব্ব,
স্বদেশ জাগেনা শুধু কথায় কথায়,
এমন স্বার্থের দাস, কাটিবে মায়ের পাশ,
হেন অসম্ভব কথা কে ভাবে কোথায়।
তুমি ভাই যে জাতির "উজ্জ্বল রতন"
তারাই প্রতিজ্ঞা করে, "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠা তরে,
ইংরেজের কাছে করে কত আকিঞ্চন।
হা অন্ধ বাঙ্গালী জাতি, স্বার্থ-মুগ্ধ, আত্মঘাতী,
বহুদূরে এখনও সে নবজাগরণ,
যে দেশের লেখা-পড়া গোলামীর আশা-ভরা,
সুশিক্ষা শিখায় যথা শোণিত শোষণ,
সে দেশে মেয়ের বাপে, "শিক্ষিত দস্যুর" দাপে
আতঙ্কে সাক্ষাৎ মৃত্যু করে আলিঙ্গন!
সে দেশের নর পশু, দেশ উদ্ধারিবে আশু?
স্বদেশ-উদ্ধার নয় সিগার সেবন।
অই দেখ প্রাচ্য খণ্ডে জাগিয়াছে চীন,
আজ তারা নিজ পায়, স্বরলে দাঁড়াতে চায়,
জগতে বিজয়-কেতু করিতে উড্ডীন;
'ছেলে বেচা'-মহারোগে,সে দেশ কভুনা ভোগে
সে দেশের শিক্ষা নহে কর্ত্তব্য-বিহীন।
আত্মত্যাগ শিক্ষা ভরা, আজ তারা আত্মহারা
সহাস্যে বিঘ্নের মুখে হয় সম্মুখীন।
জানে তারা আত্ম-ত্যাগে,কিযে মহাশক্তি জাগে,
কোথা লাগে এর কাছে কামান, সঙ্গীন,
তারা নহে বাবু বৃন্দ, আজ-বিক্রি—ব্রহ্মানন্দ,
বহু দিন হইয়াছে সে দেশে বিলীন!
মানব-মঙ্গল আশে, তারা মরে হেসে হেসে,
কর্ত্তব্যে অজেয় চির—স্বার্থ উদাসীন।

---

*ঢাকার হেরাল্ড পত্রিকা সর্ব্ব প্রথমে এই ছদ্মবেশী সমাজ-সংস্কারকের প্রকৃত পরিচয় দিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

যে জাতি জাগিয়া উঠে—জাগে এ প্রথায়,
যে দেশের অধিবাসী, কলঙ্ক-কালিমা রাশি—
নীচতা শঠতা যত ঠেলে ফেলে পায় ;
দেশের মঙ্গল জাগে, সবি আসে পুর ভাগে,
প্রভাতী নক্ষত্র যথা উষা অগ্রে ধায় ;
তারা নহে দেহী তুচ্ছ—কর্ণে গোজা হংসপুচ্ছ,
তাদের যে আশা উচ্চ হিমগিরি প্রায়,
বুঝেছে বিবাহ—ব্রত ; ছাগল ভেড়ার মত
বেহায়া রবের হাটে তারা না বিকায়,
শিখে তারা নিজ বলে, দাঁড়াইতে ভূমণ্ডলে,
বিক্রয়ার্থ পুত্র, শুনি শিহরে লজ্জায় ,
তারা জানে বীরভোগ্য,সৌন্দর্য্য,স্বাস্থ্য,সৌভাগ্য
চির দিন বহে অজ্ঞ ভিক্ষা ব্যবসায়,
তাদের হৃদয়-বলে আসমুদ্র মহী টলে,
সম্ভ্রমিত জগতবাসী বিস্ময়ে তাকায়।
কি উচ্চ হৃদয়, মন, কি ভীষণ বজ্রপণ,
কি বিদ্যুৎ বহ্নি জ্বলে শিরায় শিরায়—!
যে দেশ জাগিতে চায়— জাগে এ প্রথায়।

হের সত্য মঙ্গলের পথ-প্রদর্শক—
উন্নত বৃটিশ জাতি ,— পরাজি অরুণ ভাতি,
শিরে কোহিনূর-জ্যোতি জ্বলে ধক্ ধক্,
বিশাল সাগর-নীরে, "টাইটেনিক্" ডুবে ধীরে,
কর্ত্তব্যে নির্ভীক তার স্বাধীন রক্ষক—
শিশু, স্ত্রীজাতির তরে, অম্লান বদনে মরে;
কি ভীষণ তেজস্বিতা—জ্বলন্ত পাবক্ !
এমন না হলে পরে, সে জাতি কি হতে পারে,
পৃথিবীর অন্যতম ভাগ্য-নিয়ামক !
আর মোরা হতভাগ্য, স্বার্থ ত্যাগে অনভিজ্ঞ,
পরবৃত্তি আশে সদা জিহ্বা লক্ লক্ !
যে দেশে শিক্ষিত যুবা, হাজার, বারশ কিবা
দিলে সাঁতারিতে পারে কৌরব নরক।
যে দেশে এম-এ, বি-এ, সম্ভ্রমের মাথা খেয়ে,
শ্লীপদের মত হয় শ্বশুর-কণ্টক !
সে দেশ উদ্ধার হবে, হেন আশা কে করিবে ?
না মরিলে এই সব ভণ্ড প্রতারক।
হে রঙ্গের এনারকিষ্ট— যদি চিন্ত দেশ-ইষ্ট,
'বম্ শেলে' কর পিষ্ট এদেরি মস্তক !
ফেন-রক্ত করি বমি হউক তারা অধোগামী,
সমাজের রক্তপায়ী—ভীষণ তক্ষক।
লভুক উচিত শিক্ষা প পিষ্ঠ বঞ্চক।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ

দল।

আমি কালো ভালবাসি, তুমি শাদা ভালবাস। আমি হয়ত কালোর ভিতর অনেক সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার চক্ষে তাহা পড়ে নাই। আবার তুমি শাদার ভিতরে যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছ, আমার চক্ষে তাহা পড়ে নাই, সুতরাং তুমি যে কালো অপেক্ষা শাদাকে অধিক ভালবাস, সেটা তোমার দোষ নহে,এবং আমি শাদা অপেক্ষা কালোকে যে অধিক ভালবাসি, এটায় আমারও দোষ নাই। উভয়ের স্থান, সংসর্গ, ভূয়োদর্শন প্রভৃতি কারণে ইহা উৎপন্ন।

আমি পাহাড়ের দেশে জন্মি নাই, নদী-আবৃত দেশে জন্মি নাই, তাই আমি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিকে ভালবাসি। তুমি পাহাড়ের দেশে জন্মিয়াছ, তুমি অভ্রভেদী অচল শেখর, হিম-শুভ্র সৃঙ্গরাও শীতল সমীরণ ভালবাস, তোমার দেহ তথায় ভাল থাকে. আমার সমতলে দেহ ভাল থাকে।

এজন্য তুমিও দোষী নও, আমিও দোষী নই, ইহা প্রকৃতির নির্ব্বাচন।

তুমি যে বংশে জন্মিয়াছ, তাহাতে শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, বিষয়-বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য আছে। আমি যে বংশে জন্মিয়াছি, তাহাতে ধর্ম্ম ভাব, সাধনা, পবিত্রতা পুরুষানুক্রমে আলোচিত হইতেছে। রাম যে বংশে জন্মিয়াছে, তাহাতে শিল্প-কলা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সৌন্দর্য্য-বোধ সহজেই উৎপন্ন হয়। ভীম যে বংশে জন্মিয়াছে, তাহাতে বীরত্ব, তেজ, ন্যায়পরতা, নেতৃত্ব আপনা হইতেই সম্মানিত হইয়াছে। অথচ সেই বংশেই অর্জ্জুন জন্মিয়া কৃষ্ণ সহবাসে সাত্ত্বিক ভাব শিক্ষা করিয়াছেন। কেহ বা দেশ গুণে স্বদেশপ্রিয়তা, পরোপকার-প্রিয়তা, মনুষ্যত্ব শিক্ষা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বা প্রকৃতির গুণে স্বার্থান্বেষণ, আত্মসেবা, আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ। এজন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারিনা। সকলে বিশেষত্ব উত্তরাধিকার ক্রমে পাইয়াছে।

তুমি উকীল, ব্যবহার-শাস্ত্র শিখিয়াছ, তোমার সন্ধান-বুদ্ধি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, কুট তর্ক, বিষয়-বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়াছে। আমি চিকিৎসক, লোকের ক্লেশ নিবারণ, বেদনা লাঘব, রোগ দূর করিবার জন্য যে আয়াস ও তজ্জন্য যে লক্ষণ জ্ঞান, ভেষজ নির্দ্দেশ, ভূয়োদর্শনে আমি শিখিয়াছি। এইরূপ, কার্য্য-ক্ষেত্রেই বুদ্ধির বিকাশ হয়, তজ্জন্য তোমার কি আমার বিশেষ দোষ কি গুণ নাই।

জগৎ এইরূপ বৈচিত্র্যের রঙ্গভূমি, এই বৈচিত্র্য ভগবৎ-কৃপা, নতুবা জগৎ চলিত না। একজন চাষ করিবে, একজন কাপড় বুনিবে, একজন সেলাই করিবে, একজন পাক করিবে, একজন ঘর প্রস্তুত করিবে। ফলতঃ মানবের প্রত্যেক অধিকারী একটী করিয়া ব্যবসার সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং এক একজন উপযোগীতা অনুসারে এক এক কার্য্য লইয়াছেন। সকলেই জগৎপালিনী মাতৃ-দেবীর ঘরের কিঞ্চিৎ সাহায্যের জন্য আহূত হইয়াছে। সেই অনন্তশক্তিশালী গৃহদেবতার ঘরকন্নার এক একটী উপকরণ এক এক জনের হস্তে রহিয়াছে। চাষার হাত কাজ করিতে করিতে শক্ত হইয়াছে, রাজার হাত তৈলমর্দ্দনে কোমল হইয়াছে, পাল্কী-বেহারার কাঁধ বহন-কার্য্যের জন্য ফুলিয়া গিয়াছে। কার্য্যোপযোগী শিক্ষায় তৎসম্বন্ধে পরিবর্ত্তন, ইহাতে দোষ গুণ কিছু নাই।

অথচ আমি যেমন কার্য্য করি, তুমি তেমন কর না, আমি যাহা ভালবাসি, তুমি তাহা ভাল-বাস না। ইহা সমালোচনার বিষয়। সমালোচনা হইতে ঠাট্টা উপহাস, উপহাস হইতে তীব্র শ্লেষ, তাহা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে দল। তুমি কি মনে কর, সকলেই এক কার্য্য করিবে; যদি তাহাই কর, তবে উভয়ের মধ্যে বিবাদ কেন? বরং প্রতিযোগী ব্যবসায়ই পরস্পরের শত্রু। স্বামী স্ত্রী উভয়েই চিত্রকর। স্ত্রীর চিত্র জগৎকে মোহিত করিল। স্বামী সেই চিত্র দেখিতে আসিয়া চিত্রকলার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইল না; ক্রোধে তাহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, ঈর্ষ্যায় তাহার হৃদয়ে অগ্নি উদ্গীরিত হইল, মনে করিল, আমার যশ ইহার দ্বারা তিরোহিত হইবে। নরাধম ছোরা দ্বারা নিজের স্ত্রীকে, যে তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারে, যে জিনিষ স্বামীর অপ্রিয় জানিলে পোড়াইয়া ফেলিতে পারিত, এমন স্ত্রীকে ছোরা প্রয়োগে বিনাশ করিতে চাহিল। এই কি এক ব্যবসায় কি একরূপ কার্য্য করিলে প্রণয়?

আমি ভাবি বটে যে আমার মতন সকলে হউক। কিন্তু যদি হয়, তাহাকে আমি কি